উড্ডীন
মে-জুন ২০২২

Al-Ameen Mission

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah, Ph.: 74790 20059
Central Office: 538 Elliot Road, Kolkata 700 016, Ph.: 74790 20076

SUCCESS AT A GLANCE : 2020

Dazzling Record in NEET (UG)

Marks 626 & above Within AIR 9908: **61**	Marks 600 & above Within AIR 20174: **134**	Marks 580 & above Within AIR 30431: **238**
Marks 565 & above Within AIR 39289: **322**	Marks 550 & above Within AIR 49260: **434**	Marks 536 & above Within AIR 59825: **516**

AIR 916 (675) Jisan Hossain | AIR 1276 (670) Tanbir Ahmed | AIR 1522 (666) Md Samim | AIR 1982 (662) Ayesha Khatun | AIR 2298 (660) Al Taufeeq | AIR 2817 (656) Kanon Akhtar | AIR 2947 (655) Md Tarip Sk

Higher Secondary (12th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBCHSE	Science	2090	909	1928	2072	2089
	Arts	79	43	66	78	79
CBSE	Science	54	8	24	43	54
	Total	2223	960	2018	2193	2222

Appeared 2223	
From Poor & BPL families	605 (27%)
From lower-middle income group	775 (35%)
From middle & upper middle income group	843 (38%)

81 students have occupied their positions within 20 ranks in the H.S. examinations of the Council

Secondary (10th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBBSE	Boys & Girls	1706	461	1211	1557	1668
CBSE	Boys & Girls	71	21	48	64	70
	Total	1777	482	1259	1621	1738

Appeared 1777	
From Poor & BPL families	627 (35%)
From lower-middle income group	680 (38%)
From middle & upper middle income group	470 (27%)

15 students have occupied their positions within 20 ranks in 10th exam.

To prepare yourself as an Ideal Teacher,
Join our Institutions...

M.R. COLLEGE OF EDUCATION

(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

BIRA, BALISHA, P.S- ASHOKNAGAR, (N) 24 PGS, WB-743234
www.mrctrust.org, Email- mrctrust2012@gmail.com
Phone- (03216)-261082, Mobile- 9933163040

SAHAJPATH

(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

BIRA, BALISHA, P.S- ASHOKNAGAR, (N) 24 PGS, WB-743702
www.sahajpath.org.in, Email- sahajpath2010@gmail.com
Phone- (03216)-260058, Mobile- 9932563040

MOTHER TERESA INSTITUTE
OF EDUCATION & RESEARCH

(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

NADHIHAG, P.O- KAZIPARA, P.S- MADHYAMGRAM, (N) 24 PGS, KOL-125
www.mtier.in, Email- secretary.mother@gmail.com
Mobile- 9051073449

DR. SHAHIDULLAH
INSTITUTE OF EDUCATION.

(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

ASHNPUR, P.O- SONDALIA, P.S- SASHAN, (N) 24 PGS, WB-743423
www.dsie.in, Email- secretary.dsie@gmail.com
Mobile- 9051072035

Founder
Dr. Jahidul Sarkar
Mobile- 9734416128 / 7001575522

মীর রেজাউল করিম কর্তৃক ৩৮, ডা. সুরেশ সরকার রোড,
পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত

আর নয় ভেলোর
M.R.HOSPITAL
Sharing Love, Caring Humanity
YOUR HEALTH IS OUR PRIORITY
আমাদের পরিষেবা সমূহ
Health Insurance
M.R. HOSPITAL
Vill. & P.O - Balisha, P.S. - Ashoknagar, North 24 Parganas,
Near Bira Rail Station West Bengal, Pin - 743234
9734214214
9051214214
24/7 Emergency Services
www.mrhospital.org

মাসিক

উজ্জীবন

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর মুখপত্র

মে-জুন ২০২২
কলকাতা

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

সভাপতি : আমজাদ হোসেন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

কোষাধ্যক্ষ: মীর রেজাউল করিম

উজ্জীবন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

নির্বাহী সম্পাদক : জাহির আব্বাস, ইনাস উদ্দীন

সম্পাদক মণ্ডলী : অনিকেত মহাপাত্র, আজিজুল হক, আবু রাইহান, আমিনুল ইসলাম, তৈমুর খান, পাতাউর জামান, ফারুক আহমেদ, মীজানুর রহমান, মুসা আলি, মুহম্মদ মতিউল্লাহ, শেখ হাফিজুর রহমান, সাজেদুল হক, সুজিতকুমার বিশ্বাস

উপদেষ্টা মণ্ডলী : আলিমুজ্জমান, খাজিম আহমেদ, জাহিরুল হাসান, মিলন দত্ত, মীরাতুন নাহার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, লোকমান হাকিম, সামশুল হক, স্বপন বসু

প্রচ্ছদ : ওয়াসেফুজ্জামান (**নাম-লিপি** : সম্বিত বসু)

বর্ণ সংস্থাপন : বর্ণায়ন

বিনিময় : ৫০ টাকা

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭

ই মেল : aliahsanskriti@gmail.com, ujjibanmag@gmail.com

ই মেল এ লেখা পাঠান অথবা ব্যবহার করুন এই ঠিকানা :

মীর রেজাউল করিম, ৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (তৃতীয় তল), কলকাতা-১৪

'উজ্জীবন' আলিয়া-র পরিবর্তিত নাম

জলের পাত্র ছুঁয়ে দেওয়ার অপরাধে শিক্ষকের মারে প্রাণ গিয়েছে স্কুল পড়ুয়ার। চারিদেক খুব হই হই রব উঠেছে। কেউ কেউ প্রতিবাদীও হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সবমিলিয়ে বিষয়টা বেশ ইতিবাচক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু হায়, এমন ইতিবাচকতার উত্তাপে সেভাবে তপ্ত হওয়া যাচ্ছে কই। মনের অঙ্গনে ঘনীভূত প্রশান্তির মেঘ মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে বিপরীত ঘূর্নাবর্তে; আর সে ঘূর্ণাবর্ত উৎসারিত হচ্ছে ভারতেতিহাসের গভীর থেকে।
শূদ্র শ্রেণিভুক্ত শম্বুক বেদ পাঠ করা জনিত অপরাধ করেছিল; বিনিময়ে মৃত্যুদণ্ড উপহার দেওয়া হয়েছিল তাকে; আর সে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীশ্রী রামচন্দ্র। সেদিন তাঁর এই বিচার পরম আদর্শায়িত বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল এবং অদ্যাবধি এর বিপরীতে কোনো সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বরং কালে কালে নানা রূপে, নানা রঙে উক্ত সিদ্ধান্তের অনুবর্তন লক্ষ করা গেছে। উচ্চশ্রেণির ইচ্ছার হাঁড়িকাঠে নিম্নশ্রেণির অগণিত মানুষের বলি প্রদত্ত হওয়া আর্য-অধিকার পরবর্তী ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস।
এই যেখানে বাস্তবতা সেখানে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার সূত্রে আমাদের মানসিক সক্রিয়তার প্রেক্ষিতে আলাদা করে আশান্বিত হওয়ার কোনো জায়গা থাকে না। বরং আশা-রূপ বেড়ার ফাঁক দিয়ে আরও এক প্রস্থ অন্ধকার উঁকি দেয়। যাকে বলে মলম লাগানো সংস্কৃতি, এ ঠিক তাই নয় তো! একদল পরিকল্পনা অনুসারে ধারাবাহিকভাবে এমন ঘটনা ঘটিয়ে চলবে; আর আর একদল প্রথামাফিক আহা উঁহু করবে এবং প্রয়োজন মতো সহানুভূতির বাতাস বিলি করে যাবে; এমনটাই সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নয় তো!
তাই যদি না হবে, তবে দুই বিপ্রতীপ সত্য একই আধারে সম সময়ে জায়মান থাকে কীভাবে। কেবল জায়মান রয়েছে তাই নয়, দুই এর মধ্যেকার সমীকরণ দিনে দিনে আরও রঞ্জিত হচ্ছে ঘনিষ্ঠতার রঙে। অবস্থা যেদিকে যাচ্ছে, তাতে ইতিহাসের পটে আর এক ইতিহাস রচিত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে মনে হচ্ছে। একদিন অনার্য ভারতবাসীর রক্তে বিজিত আর্য জাতি যেভাবে হোলি খেলেছিল আজ যেন তারই স্মৃতিসুখে বিশেষ করে তপ্ত হচ্ছেন ওরা; এইসব খুচরো ঘটনার সাপেক্ষে মনের মণিকোঠায় জীবন্ত করে রাখা হচ্ছে সেই সুখস্মৃতিকে; যাতে সময়মতো তার গভীরে আবারও স্বচ্ছন্দে নিমজ্জিত হওয়া যায়; উত্তর প্রজন্মকে দীক্ষিত করা যায় এই লক্ষ্যে।

সংসদ-বৃত্তান্ত

- এই বাংলায় মুসলমান সমাজে সাংস্কৃতিক জাগরণ ও মননশীলতার প্রসার ঘটানো আমাদের লক্ষ্য।
- যা আমরা করতে চাইছি : একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ; সৃষ্টিশীল ও গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রকাশ, অন্তরালে থাকা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববর্গের জীবনীমূলক গ্রন্থমালা প্রকাশ; অপরাপর ভাষায় রচিত তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করা, গুণীজন সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান, ধারাবাহিক অনলাইন আলোচনাসভার আয়োজন, সামাজিক গবেষণা পরিচালনা, মাসিক সাহিত্যসভার আয়োজন, আমাদের মধ্যে যারা সাহিত্যচর্চা করছেন তাদের নির্বাচিত কবিতা ও গল্পের বার্ষিক সংকলন প্রকাশ, সম্ভাবনাময় লেখকদের বই প্রকাশে বিশেষ সহায়তা দেওয়া, যারা সাংবাদিকতাসহ সামাজিক গণমাধ্যমে কাজ করছেন তাদের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান প্রভৃতি।
- আগামী দিনের স্বপ্ন : কলকাতা শহরে নিজস্ব একটি স্থায়ী সংস্কৃতি-কেন্দ্র নির্মাণ; যেখানে থাকবে সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা, উন্নতমানের গবেষণা কেন্দ্র, মিলনকক্ষ, অতিথি নিবাস ইত্যাদি।
- আমরা যা করতে পেরেছি-পারছি
  - ক) উৎসব অনুষ্ঠান-সংবর্ধনা : **২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান**-এর প্রেক্ষিতে লেখক ও সম্পাদক **আবদুর রাউফ, সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারী** এবং সমাজকর্মী **রহিমা খাতুন**-কে যথাক্রমে **শহীদুল্লাহ পুরস্কার, মশাররফ পুরস্কার, রোকেয়া পুরস্কার**-এ পুরস্কৃত করা হয়।
  - খ) আলোচনাসভা : জানুয়ারি ২০২২ থেকে এপ্রিল ২০২২
  - ➠ ৮ জানুয়ারি ২০২২। **ইসলাম, দেশভ্রমণ ও ভ্রমণকাহিনি**—আমজাদ হোসেন (অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)
  - ➠ ১৫ জানুয়ারি ২০২২। **জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক গবেষণা**—নির্দিষ্ট কোনো বক্তা ছিল না। মুখ্য উপস্থাপকের ভূমিকা পালন করেন সংসদ সম্পাদক।
  - ➠ ২২ জানুয়ারি, **ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব ও ভারত**—সুমিতা দাস (সমাজবিদ, লেখিকা)
  - ➠ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২। **পুলিশ প্রশাসন ও নাগরিক সমাজ : দায়বদ্ধতার সমীকরণ**—মহিউদ্দিন সরকার (অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক)
  - ➠ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২। **সাম্প্রদায়িকতা ও গণনিধন : নাগরিক দায়বদ্ধতা**—কাজী মোহাম্মদ শেরিফ (সমাজকর্মী)
  - ➠ ৫ মার্চ ২০২২। **মাওলানা আকরাম খাঁ : জীবন ও কৃতি**—আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী (লেখক-বাংলাদেশ)
  - ➠ ২৬ মার্চ। **প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিফলন**—সনৎকুমার নস্কর (অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

গ) নাগরিক বীক্ষণ : কর্ণাটক রাজ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পোশাকবিধিকে ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে ১৭ এপ্রিল ২০২২, রবিবার **'শিক্ষার অধিকার ও পোশাক বিধি : সম্পর্কের সমীকরণ'** শীর্ষক 'নাগরিক বীক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসাবে মুখ্যভূমিকা পালন করেন নন্দিনী মুখার্জী (অধ্যাপিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), মুহম্মদ আফসার আলি (অধ্যক্ষ, শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়), রীতা দত্ত (অধ্যাপিকা, মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজ) ও রবিউল ইসলাম (অধ্যাপক, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)।

ঘ) সংবর্ধনা : অবসর প্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক মহিউদ্দিন সরকার মহাশয়কে সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয় ৫ জুন ২০২২, রবিবার, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্থিত সিলভার স্ফুন ব্যাঙ্কোয়েট সভাকক্ষে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল বিশেষ আলোচনাসভা। আলোচনাপর্বে **পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজে সাহিত্যচর্চা : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজে সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পাদনা : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজে বাচিকশিল্পেরচর্চা : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত সামাজিক সংগঠন ও তার কার্যধারা, সুন্দরবন অঞ্চলের সমাজ-উন্নয়নে নীলদিগন্ত সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রের ভূমিকা** বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব বীক্ষণ তুলে ধরেন যথাক্রমে মুসা আলি, আজিজুল হক, সেলিম দুরানি বিশ্বাস, রুহুল আমিন ও তারাপদ দাস।

ঙ) প্রকাশনা দপ্তরের কার্যক্রম

- সাহিত্যপত্রিকা আলিয়া ও উজ্জীবন নিয়মিত প্রকাশ
- গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ : সোহরাওয়ার্দী পরিবার ঐতিহ্য উত্তরাধিকার-আলিমুজ্জমান
- জীবনীমালা প্রণয়ন : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, মুজিবর রহমান, ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী
- প্রথম প্রকাশ নিঃশেষিত হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী পরিবার ঐতিহ্য উত্তরাধিকার এবং মৌলবি মুজিবর রহমান ও 'দ্য মুসলমান' বই দুটির এক সহস্র কপি করে মুদ্রণ

- যা সম্পন্ন করতে চলেছি
  - চরিতাভিধান : বাংলার মুসলমান সমাজ অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবে
  - জীবনীমালায় সংযুক্ত হতে চলেছে **মাওলানা ভাসানি** ও **শাহাদাৎ হোসেন**
  - শেখ কামাল উদ্দীন রচিত **নাট্যকার নজরুল** প্রকাশিত হওয়ার পথে
  - মুন্সী আবদুর রহিম এর **গল্পসংকলন** প্রকাশের কাজ চলছে
  - **নূরন্নেছা খাতুন রচনা সমগ্র** আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে
  - অনতিবিলম্বে চূড়ান্ত রূপ পেতে চলেছে (রাজ্যসরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত) মাদ্রাসা বিষয়ক ডকুমেন্টারি—**মাদ্রাসা শিক্ষা : জিজ্ঞাসা; প্রতীতি**
  - সংস্থার নিবন্ধীকরণের জন্য প্রস্তুতি চূড়ান্ত প্রায়

উজ্জীবন-এর স্বজন

- **২৪ পরগনা-উত্তর**
  আমিনুল ইসলাম, বারাসাত,
  ৯৪৩৩২৩১২০৪
  মশিহুর রহমান, রাজারহাট,
  ৮০১৭৩৪৩১৫৬
  হাকিমুর রশিদ, হাবড়া,
  ৯৭৪৮৮৫১১৭৬
- **২৪ পরগনা-দক্ষিণ**
  আব্দুল আজিজ, সংগ্রামপুর,
  ৮১৪৫৪৪৪১৯৫
  আসাদ আলি, ভাঙ্গড়, ৯১২৩৬৮৯৬১৫
  মুসা আলি, জয়নগর,
  ৯১৫৩১৩৫৪৬৮
- **কোচবিহার**
  মাহাফুল হোসেন, মাথাভাঙা,
  ৯৫৬৩৩
  সুরাইয়া পারভিন, শীতলকুচি,
  ৮৭৬৮২৭৩৯১২
- **জলপাইগুড়ি**
  আরমান সেলিম, ৯০৯৩৮৮৫৫৪৬
- **দিনাজপুর-উত্তর**
  আসফাক আলম, ৭৯৮০৪৩৪৬২৫
- **দিনাজপুর-দক্ষিণ**
  মীরাজুল ইসলাম, ৮৭৭৭৬৮৯৬৫১
- **নদীয়া**
  সাজাহান আলী, কৃষ্ণনগর,
  ৯৪৩৪২৪৫২৬২
  সুজিত বিশ্বাস, করিমপুর,
  ৮৯১৮০৮৯৯৬৩
  হরিদাস পাটোয়ারী, রাণাঘাট,
  ৬২৯৫৮২৭৬৪৫
- **বর্ধমান-পশ্চিম**
  আমিরুল ইসলাম, দুর্গাপুর,
  ৯৮৩২৭৪৯২৮৭
- **বর্ধমান-পূর্ব**
  কারিমুল চৌধুরী, বর্ধমান সদর,
  ৭০০১২৪৪২৮৮
  রমজান আলি, বর্ধমান সদর,
  ৯৪৩৪০১৪১১৭
  সামসুজ জামান, জামালপুর,
  ৬২৯০৯৫৬৪৫৪
  সোমা মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান সদর,
  ৯৫৩১৫৯৮৬৫৩
- **বাঁকুড়া**
  ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ,
  ৯৪৭৬২৬৮৫৫৪
- **বীরভূম**
  তৈমুর খান, রামপুরহাট,
  ৯৩৩২৯৯১২৫০
  ফজলুল হক, সিড়ডি, ৮২৪০৯৭৯০৯৩
  মেহের সেখ, লাভপুর,
  ৮৫০৯১০২১৫৪
- **মালদা**
  জুলফিকার আলি, চাঁচল,
  ৯৭৩৪১৯২১৭৫
  মহঃ আদিল, মালদা সদর,
  ৯৭৩৫৯৩৭৯৫০
  মহঃ ইব্রাহিম, মালদা সদর,
  ৮৯৭২৫১৯৮৭৯
  শাহ নওয়াজ আলম, কালিয়াচক,
  ৭০০১২৭৪৯১৫

- **মেদিনীপুর-পশ্চিম**
  কামরুজ্জামান, খড়গপুর,
  ৯৯৩২২১৫০৩৪
  বিমান পাত্র, ঘাটাল,
  ৯৪৭৬৩২৯৩১২
  সেখ সাব্বির হোসেন, মেদিনীপুর সদর, ৯৬৭৯১৪৮১৭২
- **মেদিনীপুর-পূর্ব**
  আমিনুল ইসলাম, হলদিয়া,
  ৯০০২৩৭৯৪২৯
  ওয়াহেদ মীর্জা, এগরা,
  ৯১৬৩৩৮৭৬৬৭
  মোকলেসুর রহমান, কাঁথি,
  ৭০০৩৫৫৪০০৪
- **মুর্শিদাবাদ**
  আনোয়ারুল হক, বেলডাঙ্গা,
  ৯৭৩৫৯৪৭৯১১
  আলিমুজ্জমান, বহরমপুর,
  ৮৬৩৭৫৯৩৭৭২
  মহঃ বদরুদ্দোজা, ডোমকল,
  ৮০১৬১৬১৭৬৫
- **দার্জিলিং**
  অঙ্কুর মহন্ত, ৯৬৪১২৪২৪১১
- **হাওড়া**
  ইসমাইল দরবেশ, সাঁতরাগাছি,
  ৭০০৩৪৪৬৬৯৪
  মনিরুল ইসলাম, বাগনান,
  ৭৯০৮১৮৮০৭১
  সেখ নুরুল হুদা, বাগনান,
  ৯০৭৩৩১২১৮১
- **হুগলি**
  আনোয়ার সাদাত হালদার, ফুরফুরা শরীফ, ৮৯০২৪০৮৪২০
  মুজিবর রহমান, হরিপাল,
  ৯৬৩৫৭০৬২২০

উজ্জীবন : প্রাপ্তিস্থান

- অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ: বুক কর্ণার, ৯৪৭৫৯৫৩৩৪৫
- করিমপুর, নদীয়া: করিমপুর পুস্তক মহল, ৯৭৩৩৮১১৮১৯
- কলকাতা : পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, অপূর্ব, নিউ লেখা, মল্লিক ব্রাদার্স, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
- কৃষ্ণনগর, নদীয়া: বইঘর, ৯৭৩২৫৪১৯৮৪
- চাঁচল, মালদা : পুথিপত্র
- ডোমকল, মুর্শিদাবাদ: রিলেশন (বুকস্টল), ৯৭৩২৬০৯২১০
- দুবরাজপুর, বীরভূম : টিচার্স কর্নার
- বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান : রমজান অ্যাকাডেমী, ৮৭৭৭৩৯৬৬৩২
  বিবেকানন্দ বুক অ্যান্ড জেরক্স সেন্টার, ৯৩৭৮১৩২৬৮৭
- বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা : সাহা বুক স্টল, ৯৮৩২৮০৬৬৬৩
- বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ : বিশ্বাস বুক স্টল, ৯৮০০০০০০৪৯
  আদর্শ বুক সেন্টার, ৯৪৩৪৩৯৪৪৫২
- বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা : মল্লিক গ্রাফিক্স, ৯১৬৩৪৮৬৭৬৬
- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : অন্নপূর্ণা বুক হাউস, ৯৭৮৩৭৪৪৪৯৮
- বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর : কৃষ্ণ বুক হাউস, ৯৪৩৪৩৯৪২১২
- মালদা, মালদা: পুনশ্চ, ৯১২৬৫২৩৭৫৪
- মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর : মল্লিক পুস্তক বিপণি, ৯৯৩২০৫৭৬৬৭
- শিলিগুড়ি, দার্জিলিং: ইকনমিক বুক স্টল
- সংগ্রামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ছাত্র সাথী, ৯৫৯৩৪৮২১৬৯
- সিউড়ি, বীরভূম : ভারত পুস্তকালয়

সংস্কৃতি

রমজান আলি । বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা : প্রাক্-তুর্কি যুগ।১১

ইতিহাস

সুমিতা দাস। শিল্প বিপ্লবে ভারতের বস্ত্রশিল্পের ভূমিকা। ৩৬

দৃষ্টিপাত

বন্দে আলি। মুসলমাদের স্বাধিকার : পক্ষ প্রতিপক্ষ। ৪২

এমদাদ হোসেন। শিক্ষা, শিক্ষা এবং শিক্ষা। ৪৪

কবিতা

রথীন পার্থ মণ্ডল-৪৬, কাজী গোলাম গউস সিদ্দিকী-৪৬, মুহম্মদ মতিউল্লাহ-৪৭, জিয়া হক-৪৮, আজিবুল সেখ-৪৯

উপন্যাস

কাঙালনামা। মেকাইল রহমান। ৫০

গল্প

মুহাম্মদ জিকরাউল হক। বাঁশ। ৫৮

কালাম শেখ। লিবিডো। ৬৬

অনুভূতি

সৈয়দ হাসনে আরা বেগম। অস্তিত্বের আলো ছায়ায় সংখ্যালঘু নারী। ৭২

বঙ্গ-দর্পণ

বিকাশকান্তি মিদ্যা। চৌকিদারের নিশিডাক। ৭৬

আব্দুল বারী। সুচি শিল্পের সেকাল। ৮০

বইচর্চা।

সাইফুল্লা -৮৭, আলিমুজ্জমান-৮৯, জাহির আব্বাস-৯৩

সাংস্কৃতিকি।

ডোমকল কলিংয়ের সাংস্কৃতিক সম্মিলন-৯৫

গ্রেস কটেজে নজরুল জন্মজয়ন্তী-৯৬

নিবেদন

- বার্ষিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা দিয়ে মাসিক 'উজ্জীবন' এর গ্রাহক হন। এ বিষয়ে আপনার নিকটবর্তী প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
- আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের যাবতীয় প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য বার্ষিক ১০০০/- (এক হাজার) টাকার বিনিময়ে সার্বিক প্রকাশনা গ্রাহক হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। এই অর্থ এমনিতে অনুদানমূলক সহায়তা হিসেবে বিবেচিত হবে; পাশাপাশি এর সাপেক্ষে সংসদ প্রকাশিত 'উজ্জীবন' সহ যাবতীয় পুস্তক উপহার হিসেবে প্রদান করা হবে; যার অর্থমূল্য হবে এক হাজার বা ততোধিক টাকা।
- আমাদের এই পথচলায় আপনাকে সহযাত্রী ও সহকর্মী হিসাবে পেতে চাই। অনুরোধ থাকছে, সাধারণ অনুদানের পাশাপাশি বৃহত্তর লক্ষ্য রূপায়ণের লক্ষ্যে, বিশেষত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের সাপেক্ষে আপনার দেয় যাকাতের অংশবিশেষ প্রদান করুন।

লেনদেন

A/C 31590592615
1FSC SBIN0001299
PHONEPE 7872422313
GPAY 9734662218
হোয়াটস্‌অ্যাপে (৮৬৩৭০৮৬৪৬৯) স্ক্রিন শট পাঠানোর অনুরোধ করছি
যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭, ৯৪৩২৮৮০২৪২
aliahsanskriti@gmail.com

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশনা

সোহরাওয়ার্দী পরিবার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার—আলিমুজ্জমান
নেপথ্য নায়ক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন—খন্দকার মাহমুদুল হাসান (জীবনীমালা-১)
মৌলবি মুজিবর রহমান ও 'দ্য মুসলমান'—মিলন দত্ত (জীবনীমালা-২)
ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ও বাংলার নবজাগরণ—সামশুল আলম (জীবনীমালা-৩)
নূরন্নেছা খাতুন রচনা সমগ্র—মীর রেজাউল করিম (প্রকাশিতব্য)
চরিতাভিধান বাংলার মুসলমান সমাজ—সম্পাদকমণ্ডলী (প্রকাশিতব্য)

রমজান আলি

বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা : প্রাক্-তুর্কি যুগ

কথামুখ

প্রাচীন ইতিহাস অনুমান নির্ভর। যুগস্বাক্ষর তথা নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে যুক্তি পরম্পরায় অনুমানের পর অনুমান সাজিয়ে এক সময় গড়ে ওঠে ইতিহাসের তত্ত্ব। যিনি ইতিহাস লিখছেন তার মানসিক সংগঠনটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মার্ক্সবাদী মনোভাব থাকলে একরকম ইতিহাস লেখা হবে, আবার জাতীয়তাবাদী হলে আর একরকমের ইতিহাস লেখা হবে। রচয়িতা তার বাক্যতাত্ত্বিক সংগঠনের কক্ষে জমে থাকা শব্দভাণ্ডার থেকে সেই ধরণের বাক্যের জন্ম দেবেন। যিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতায় বদ্ধ, তাকে তার সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করবে। ভারতবর্ষের যে কোনো বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটে চলেছে। শুধু সভ্যতার ইতিহাস লেখা নয়, সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষার ইতিহাস এমন কি সংস্কৃতির ইতিহাসও এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত নয়। বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্য যুগ, এমনকি আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এমন একটা অভিমুখ কাজ করেছে। সহজ সত্যটাকে সর্বদা মেনে নেওয়া হয়নি। আসল কথা হলো, যে কোনো রচনায় বা আলোচনায় বস্তুভিত্তিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা উচিত।

বিজ্ঞানের দিক থেকে Ecology শব্দটির বাংলা পারিভাষিক শব্দ করা হয়েছে বাস্তুবিদ্যা বা বাস্তব্যবিদ্যা। এখন অবশ্য পরিভাষা ছাড়াই ইকোলজি শব্দটি বাংলা অভিধানে প্রবেশের মুখে। গ্রীক শব্দ 'oicos' শব্দটির ইংরাজি পারিভাষিক শব্দ হলো home বা বাড়ি এবং 'logos' শব্দটি ইংরাজিতে 'study'। যার বাংলা পারিভাষিক শব্দ করা হয়েছে 'বিদ্যা' বা 'আলোচনা'। তবে গ্রীক logos শব্দের আর একটি অর্থ হলো জ্ঞান। অর্থাৎ ইকোলজি হলো বাস্তুজ্ঞান। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবগোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্ক, জীব ও তার পরিবেশের বিভিন্ন পারস্পরিক ক্রিয়া নিয়ে চর্চা করা হয় তাকেই বলা হয় ইকোলজি বা বাস্তব্যবিদ্যা। বিজ্ঞানী Ernst Haeckel ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ইকোলজি শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তবে বিজ্ঞানী Reiter ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে এই শব্দটি ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে প্রয়োগ

করেছিলেন। আমরা আমাদের চারপাশে বিভিন্ন উপাদানের সহযোগিতায় বেঁচে থাকি। যেমন — আলো, বাতাস, মাটি, জল, উদ্ভিদ, প্রাণি ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব নিয়েই আমাদের পরিবেশ গড়ে ওঠে। এখন আমাদের এই পরিবেশটা কী অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা রাঢ়ের পরিবেশ? এই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আমাদের একটা আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে এই পরিবেশ গড়ে উঠতে সময় লেগেছে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর। আর পৃথিবীর বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষ জন্ম নিয়েছে মোটামুটি ২ লক্ষ বছর আগে। এরপর পরিবেশের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ঘটেছে।

ধর্মগ্রন্থগুলির দিক থেকে ধর্মতত্ত্ব দর্শনে পৃথিবীর ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স তৈরির একটা আভাস পাওয়া যায়। আরণ্যক দর্শন ও সাঁওতালি ঈশোপনিষদ অনুযায়ী এই পৃথিবী প্রথম বিশাল জলাভূমি ছিল। সেখানে দুটি হাঁস সাঁতার কাটছিল। সর্বশক্তিমান কোনো শক্তির নির্দেশে মারাংবুরু তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাদের দুটি ডিম থেকে সৃষ্টি হয় আদিম মানব পিলচু হাড়াম আর আদিম মানবী পিলচু বুড়হি। তাদেরই বংশধর হল খেরোয়াল জাতি। খের্ অর্থাৎ পাখির বংশধর। এখান থেকেই এসেছে 'খেচর' শব্দটি; নাকি পশু-পাখি শিকার করে খায় যারা? নিশ্চিত করে বলা যায় না।

আর্যদের ভাবনা অনুযায়ী মঙ্গলকাব্যগুলিতে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম অর্থাৎ আদি-ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের একটা জ্যোতি বা আভা মাত্র বর্তমান ছিল, বাকি সব অন্ধকার। সেই শূন্য অন্ধকার থেকেই একদিন নিরাকার ব্রহ্মের সৃষ্টি। তিনি দেহ ধারণ করলেন সৃজন ও পালনের জন্য এবং তাঁর বাহন উলুকের অর্থাৎ পেঁচার সৃষ্টি হল নাসাপুটে। উলুকের পিপাসা পুরণের জন্য জলের সৃষ্টি হল, প্রকৃতির সৃষ্টি হল। এরপর তিনি তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের জন্মদান করে আত্মগোপন করলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর জপ করতে বসলেন। আদি-ব্রহ্ম তাঁদের মনের অবস্থা বুঝবার জন্য অন্য অর্থে পরীক্ষা করার লক্ষ্যে, ছল করে দুর্গন্ধ মৃতদেহরূপে ব্রহ্মার কাছে ভেসে এলে, দুর্গন্ধে নাকে হাত দিয়ে ব্রহ্মা তাঁকে বাঁ হাতে দূরে ঠেলে দিলেন। তারপর তিনি বিষ্ণুর কাছে গেলে বিষ্ণুও তাঁকে চিনতে না পেরে ঠেলে দিয়ে দূরে ভাসিয়ে দিলেন। শেষে ভোলা মহেশ্বর অর্থাৎ শিবের কাছে আসা। শিব মড়াগন্ধ পেলেন

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে এই পরিবেশ গড়ে উঠতে সময় লেগেছে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর। আর পৃথিবীর বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষ জন্ম নিয়েছে মোটামুটি ২ লক্ষ বছর আগে। এরপর পরিবেশের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ঘটেছে।

বটে, কিন্তু কোনো পরোয়া করলেন না; মড়া নিয়েই তো তাঁর পথ চলা। তিনি আনন্দে নৃত্য শুরু করলেন—'আনন্দে বাড়িল বড় বুঝি ব্রহ্ম-তনু। জীব জন্তু নাই কিন্তু জলে অঙ্গজনু। এত ভাবি সদানন্দ বিহ্বল হইয়ে। মহেশ নাচেন মৃত মায়া-তনু লয়ে। (ধর্মমঙ্গল : স্থাপনাপালা : পয়ার নং - ১০৮-১০৯)। সঙ্গত কারণে খুবই সন্তুষ্ট হলেন আদি-ব্রাহ্ম। তিনি ভোলানাথকে সৃষ্টিকর্তার সম্মানে ভূষিত করলেন। আদি-ব্রহ্মার কাছ থেকে সৃষ্টি করবার অধিকার অর্জন করে, মহাদেব ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টিকে ধারণ করার জন্য তখনো বসুন্ধরার অস্তিত্ব নেই। আদি-ব্রহ্ম বরাহরূপ ধরে পাতাল থেকে পৃথিবীকে উপরে আনলেন। এরপর সুমেরু পর্বত, সপ্ত স্বর্গ, পাতাল, সপ্ত দ্বীপ, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস প্রভৃতি সৃষ্টি করা হল। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সৃষ্টির পালন এবং মহাদেবকে ধ্বংস করবার ভার দিলেন। ব্রহ্মা বিভিন্ন দেবদেবী, দানব, স্থাবর-জঙ্গম, নদ-নদী, দণ্ড-পল, দিন-রাত্রি, বিভিন্ন ঋতু, মাস, বৎসর, যুগ, মন্বন্তর, সংখ্যা ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন।

ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী কোরানে পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে, দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে — 'বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি দু-দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তার সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক!' (৪১: ৯) এখানে 'দু-দিন' শব্দটা সময় অপেক্ষা আল্লার ক্ষমতা বোঝাতেই অধিক প্রযোজ্য। লোকায়ত উক্তির মতো (দু-দিনে করে দেবো)। সৃষ্টির সাম্য বিধানে এলো আকাশমণ্ডলী। সৃষ্টির কাজে সময় লাগলো আরও ছয় দিন। এ প্রসঙ্গে কোরানে বলা হয়েছে — 'নিশ্চয়, তোমাদের প্রতি আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তারই আজ্ঞাবাহী, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশদান তারই কাজ। তিনি মহিমাময় বিশ্ব-প্রতিপালক। (৭ : ৫৪)।

পৃথিবী সৃষ্টি হলো; জল, মাটি, মানুষ, প্রকৃতি এসবও সৃষ্টি হলো। বিজ্ঞানও বলছে ধর্মগ্রন্থগুলোও বলেছে। কিন্তু গোটা পৃথিবীর ঠিক কোন জায়গাটাতে মানুষ সৃষ্টি হলো? ধর্মীয় প্রবক্তারা যদি বানর শিম্পাঞ্জী সিরিজে মানুষ সৃষ্টির কথা নাই মানতে চান, তা হলে বিজ্ঞানের সূত্র ধরেই পৃথিবীর ঠিক কোন জায়গাটা? তখন আমাদের অনেকের মাথায় আসে ইতিহাসে তো আমরা প্রাচীন সভ্যতার কথা পড়েছি, তার কোন একটাতে নিশ্চয় হবে। কিন্তু কোনটা? কোনটা প্রাচীন? মায়া সভ্যতা? রাঢ় সভ্যতা? এখন যাকে প্রাচীন হিসাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সেই ধারণারও তো পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাহলে মানুষের উৎসভূমি কী রাঢ়?

সৃষ্টিতত্ত্বের সূচনাতেই মহাসমুদ্রের কথা বলা হয়েছে। সে সমুদ্রের নাম নেই। ধীরে ধীরে পৃথিবীর একটা ইকোলজি গড়ে উঠেছে। সভ্যতার ইতিহাস চর্চায় যে প্রধান আঠারোটি সভ্যতার কথা বলা হয়েছে সেখানে রাঢ় শব্দটার তেমন কোনো উল্লেখ নেই। অথচ তথ্য প্রমাণ জোগাড় করতে করতে একদিন এটা প্রমাণ করা যাবে যে, ভারতবর্ষের অন্যতম

ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা—রাঢ় সভ্যতা। তারপর দ্রাবিড় সভ্যতা অর্থাৎ হরপ্পা-মহেঞ্জদারো ইত্যাদি। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা রাঢ়। যদি সেটা কোনো একদিন প্রতিপন্ন হয়, তাহলে আমরা বলতে পারবো এই রাঢ়ই হলো পৃথিবীর অন্যতম আদিম সভ্যতা এবং এটাই বাঙালিদের মূল উৎসভূমি। লাঢ় বা রাঢ় শব্দটি নিশ্চিৎ রূপে অষ্ট্রিক শব্দ। যার অর্থ হলো ‘লাল মাটির দেশ’।

প্রাচীন সভ্যতা—রাঢ় সভ্যতা। তারপর দ্রাবিড় সভ্যতা অর্থাৎ হরপ্পা-মহেঞ্জদারো ইত্যাদি। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা রাঢ়। যদি সেটা কোনো একদিন প্রতিপন্ন হয়, তাহলে আমরা বলতে পারবো এই রাঢ়ই হলো পৃথিবীর অন্যতম আদিম সভ্যতা এবং এটাই বাঙালিদের মূল উৎসভূমি। লাঢ় বা রাঢ় শব্দটি নিশ্চিৎ রূপে অষ্ট্রিক শব্দ। যার অর্থ হলো ‘লাল মাটির দেশ’। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা’ গ্রন্থে ‘গঙ্গারিডি রাজ্যের অবস্থান নিয়ে কিছু তথ্য আছে। টলেমির ‘Treatise on Geography’-তে ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ বা গঙ্গানদীর নিম্ন অঞ্চলকে ‘গঙ্গারিডি’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভার্জিলের ‘জর্জিকাশ’ কাব্যে ‘গঙ্গারিঢ়ি’ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। শব্দটি বাংলা অপভ্রংশে ‘গঙ্গ রাঢ়ি’ হয়েছে। তার থেকেই নামটি সংক্ষিপ্ত রূপে ‘রাঢ়’ হয়েছে। এই নাম ধরে কঁকসার জঙ্গলে শিব হয়েছেন রাঢ়ের দেবতা ‘রাঢ়েশ্বর’। চিন সভ্যতা এই ভূমির নাম দিয়েছিল ‘লাতি’, আর বিদেশ থেকে আগত আর্যদের নাম দেয় ‘রাঠ’। ব্রাহ্মণদের অনেকেই নিজেকে রাঢ়ী বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা করেনি। যে ‘গঙ্গারিডি’ বা গঙ্গারিঢ়ির কথা বলা হচ্ছে, তা আসলে গঙ্গা-রাঢ়ি বা গঙ্গা-রাঢ়। বারবার গঙ্গা শব্দের প্রয়োগ দেখে বোঝা যায়, যে তারা গা সভ্যতার বা নদী কেন্দ্রিক সভ্যতার কথা বলেছেন। গাঙ হলো যে কোনো নদী অর্থাৎ এখনকার মতো শুধু গঙ্গা নয়। বলা হয়, রাঢ়ের মূল গাঙের কূল।

নানা তথ্য প্রমাণে গবেষকরা এটা বলেছেন, যে একসময় পৃথিবীতে আর্যাবর্ত ছিল না। ‘বোঙা’দের বঙ্গ ও দক্ষিণে সমতলভূমি ছিল। এমনকি রাজস্থান, গুজরাটে মরুভূমি এবং আরব সাগরের উত্তরাংশও ছিল না। বরং ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপের সঙ্গে সেই বরফের যুগে দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিমে আফ্রিকা, পূর্বে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া একটা ভূখণ্ড রূপে যুক্ত ছিল। একটাই মাত্র প্লেটের উপর এইসব ভূখণ্ড ছিল। ইরফান হাবিব তাঁর প্রাক্ ইতিহাস: ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস-১’ গ্রন্থে জানিয়েছেন —‘ভৌগোলিক রূপ-সজ্জার (যেমন আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে) আধারে এমন একটি প্রাচীনতর সংযুক্তির প্রস্তাবনা রয়েছে পুরোনোকালের তত্ত্ব—মহাদেশীয় সঞ্চরণ’-এ। এই তত্ত্বে মনে

করা হয়, যে আমাদের আজকের ভারতবর্ষ দক্ষিণ গোলার্ধের 'গণ্ডোয়ানা ভূমি' নামের এক অতি-মহাদেশের (super-continent) অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, কুমেরু, আফ্রিকা, এবং দক্ষিণ আমেরিকা নিয়ে গড়া এই 'গণ্ডোয়ানাভুম' (মধ্য ভারতবর্ষের গণ্ডোয়ানা শিলার নামে যার নামকরণ)। আবিষ্কৃত ভৌগোলিক কালের প্রায় সমগোত্রীয় প্রজাতির জীবাশ্মেও এই তত্ত্ব সমর্থিত হয় যে, একদা ভারতবর্ষ অতি মহাদেশের অঙ্গীভূত ছিল।' (ভাষান্তর কাবেরী বসু)।

তারপর তো বারেবারে ভূ-আলোড়নের ফলে পাতের ধাক্কাধাক্কিতে অনেক কিছু উলোট-পালট হয়েছে। একসময় ছিল বরফের যুগ। তারপর ক্রমে বরফ যুগ শেষ হয়েছে। বড়ো বড়ো সব জীবজন্তু ধ্বংস হয়েছে বা ক্ষুদ্রাকৃতি হয়েছে। সমুদ্রে থাকা ম্যামথ, ফসিলে পরিণত হয়েছে। আর তার বংশধর হিসাবে রেখে গেছে হাতি। ডাইনোসর, গুন্টাসর ইত্যাদি প্রাণিদের যুগ শেষ হয়েছে। এদিকে বরফ গলে রাঢ়ের লাল মাটিতে জন্ম নিয়েছে অরণ্য, অরণ্যের গাছপালাই ডেকে এনেছে মেঘকে। অরণ্যের পরিবেশে জন্ম নিয়েছে নানা প্রাণি। তারপর একদিন গরিলা থেকে কালো কালো সব শক্তিমান মানুষ। এই রাঢ়ভুমির মানুষই পশুচারণ থেকে ক্রমশ চাষবাস শিখেছে। কৃষিজাত ফসল পাওয়ার আনন্দে ফাগুন মাসের আগুন ধরা পলাশ ফুল মাথায় গেঁথে একদিন তারা যে নাচ শুরু করেছিল তা আজও অব্যাহত। অর্থাৎ অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর সব মানুষ। বর্তমান আন্দামানে থাকা জারুয়া, সেন্টালিজ ইত্যাদি গোষ্ঠী, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম মানুষ, আমেরিকার আদিম মানুষ, সব আদিমরা সম্ভবত রাঢ় থেকেই পৃথিবীময় ছড়িয়েছে। সুতরাং বাইরে থেকে ভারতভূখণ্ডে মনুষ্যপ্রজাতির আসা এই বহুল প্রচলিত ধারণা আমরা মানবো কিনা সে বিষয়ে আমাদের নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

ভারত উপমহাদেশ নিয়ে আরবদেশের একটা ধারণা আছে। মূলত বাণিজ্যিক সূত্র ধরেই স্থল পথে ভারতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ইউরোপীয় বণিকদের আগে। তাদের ধারণা প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অপরাধে স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর প্রথম মানব আদম (আঃ) ভারতের দক্ষিণাংশ শ্রীলঙ্কায় আর মা হাওয়া (আঃ) আরবের জেদ্দাতে অবতীর্ণ হন। আদম এখান থেকে গিয়েই আরাফতের ময়দানে হাওয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এক সময় এগুলো হয়তো একটাই ভূখণ্ড ছিল বলে মনে করা হয়। আর আল্লার বাণীবাহক ফেরেস্তা বা দেবদূত জিব্রাইল (আঃ)-ও ভারতে অবতীর্ণ হন। দ্বিতীয় নবী শিস (আঃ)-এর বসতিও ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষ। আজাদ বিলগ্রামীর 'সাবহাতুল মারজান' গ্রন্থে এ সব তথ্য পাওয়া যায়। স্বর্গ থেকে আসার সময় আদমের হাতে হাজার আওসাদ বা পবিত্র স্বর্গীয় কালো পাথর যেটা ছিল তা শ্রীলঙ্কা থেকে প্রাচীন ভারত ঘুরে কাবায় পৌঁছায়। আরবি-ফারসিতে 'তোবা' নামের একটি গাছ আছে যাকে জান্নাতী বা স্বর্গীয় গাছ (আর্যীয় ধারণায় অনুরূপ 'পারিজাত) বলা হয়। এই গাছটিও আদম স্বর্গ থেকে এনেছিলেন। হজরত মহম্মদ নিজে ভারতকে ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। হাদিসের একটি দুর্বল তথ্য থেকে জানা যায় তিনি নাকি বলেছিলেন — 'হিন্দুস্তানের দিক থেকে আমার প্রতি

স্নিগ্ধ শীতল মৃদু হাওয়ার হিল্লোল ভেসে আসে।' চতুর্থ খলিফা হজরত আলি (রাঃ) ভারতভূমি এবং মক্কাকে পৃথিবীর দুটি উত্তম ভূখণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বভূমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বব্যঞ্জক দেশ কোনটি? — সিরিয়ার এক পণ্ডিতের করা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হজরত আলি সরন্দ্বীপ বা শ্রীলঙ্কার কথা বলেছিলেন, কারণ স্বর্গচ্যুত হয়ে এখানেই আদম (আঃ) অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীপাড়া প্রদেশে আদমচূড়া (পবিত্র পদচিহ্ন)-য় তাঁর পায়ের ছাপ আছে বলে কথিত।

শ্রীলঙ্কা, সিংহলি ভাষাতে শ্রী লাংকাবা, আর তামিলে বলা হয় ইলাংগাই। আগে ইংরেজরা বলতো সিলন। মঙ্গলকাব্যে সিংহল বলে এই দেশটাই আমাদের মাথায় ইমেজ

'হিন্দুস্তানের দিক থেকে আমার প্রতি স্নিগ্ধ শীতল মৃদু হাওয়ার হিল্লোল ভেসে আসে।' চতুর্থ খলিফা হজরত আলি (রাঃ) ভারতভূমি এবং মক্কাকে পৃথিবীর দুটি উত্তম ভূখণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বভূমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বব্যঞ্জক দেশ কোনটি? — সিরিয়ার এক পণ্ডিতের করা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হজরত আলি সরন্দ্বীপ বা শ্রীলঙ্কার কথা বলেছিলেন, কারণ স্বর্গচ্যুত হয়ে এখানেই আদম (আঃ) অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীপাড়া প্রদেশে আদমচূড়া (পবিত্র পদচিহ্ন)-য় তাঁর পায়ের ছাপ আছে বলে কথিত।

তৈরি করে। গ্রিক ভূগোলবিদরা বলছেন তপ্রোবান। আরবদের কাছে সেরেনদী। পর্তুগিজরা বলে লোও। সংস্কৃত শব্দে শ্রী হল পবিত্র, আর লংকা মানে দ্বীপ। অর্থাৎ পবিত্র দ্বীপ। এই পবিত্র দ্বীপের মূল মানুষেরা অধিকাংশই কালো। কঙ্কনায় রাবণের বংশধর অর্থাৎ দ্রাবিড়। শ্রীলঙ্কার সরকারি ভাষা সিংহলি-তামিল আসলে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা। এম.শ্রীনাথ তাঁর গবেষণায়, দ্রাবিড় গোষ্ঠির প্রায় ৫০০ শব্দের সঙ্গে এদিকে আন্দামানের জারোয়া শব্দের মিল পেয়েছেন। দ্রাবিড় না অস্ট্রিক কোনটা আদিম? এনিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক আছেই।

ধারণা করা হয়েছে সম্ভবত একটা বরফ গলা নদী পূর্ব বা দক্ষিণ মুখে বিস্তারিত ছিল। একটি উঁচু ভূমি হিসাবে বিন্ধ পর্বতের কথা বলা হয়েছে। কোটি কোটি বছর ধরে এই সব

পর্বত শ্রেণির ঝড়, ঝঞ্জা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এদের উচ্চতা কমেছে এবং এদের ক্ষয়িত অংশ নদী পথ ধরে সম্ভবত রাঢ় ভূমিকে প্লাবিত করেছিল। আজকের রাঢ়ের লাল মাটির পলিস্তর বাহিত হয়ে এসেই 'ডোবা' বা ডবাক-কে গাছপালার উপযোগী জঙ্গলভূমিতে পরিণত করেছিল। এটা চাক্ষুস প্রমাণে বলা যায়, যে পশ্চিম রাঢ়ের যে তরঙ্গায়িত মালভূমি যা পূর্ব রাঢ়ে এসেছে তা অনেকটাই সমতল। এই পশ্চিম থেকে পূর্ব বৃহত্তর ভূমিই হলো রাঢ়।

রাঢ় সভ্যতার জন্মের বহু লক্ষ বছর পরে টেথিস সাগরের হিমালয়ে পরিণতি ঘটে। পরে হিমালয়ের বরফগলা জল গঙ্গা দ্বারা বাহিত হয়ে এই রাঢ়ভূমিকে বালি আর পলি দ্বারা প্লাবিত করে আরও সমতল ভূমিতে পরিণত করেছে। সংস্কৃত ভাষায় সমতলকে বলা হয় সমতট। আর রাঢ়ী তথা বাংলা ভাষায় তাকে বলা হয় বাগড়ী। মানুষের জন্ম যদি দু-লক্ষ বছর আগে হয় তবে রাঢ় ভূমির জন্ম হয়েছে তারও আগে। এ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা হয়েছে কিনা জানা নেই। তাছাড়া প্রাচীন নিদর্শন অনুসন্ধানের জন্য রাঢ়ের উপর তেমন খনন কার্যও এখনও হয়নি।

প্রাচীন রাঢ় হল অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ। এখন বলা হয় উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ভাগীরথী আর পশ্চিমে ছোটোনাগপুর অঞ্চল। আধুনিক রাঢ়কে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—পূর্ব রাঢ় ও পশ্চিম রাঢ়। পূর্ব রাঢ় হলো মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, সমগ্র হুগলী, সমগ্র হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বাঁকুড়া। আর পশ্চিম রাঢ় হলো সাঁওতাল পরগণা তথা সমগ্র ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণ বিহার, বীরভূমের উত্তর পশ্চিম অংশ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর। রাঢ় নিয়ে এত কথা বলার কারণ আমাদের বাংলাভাষা-সংস্কৃতির ও বাঙালির শিকড় রাঢ়ভূমিতেই প্রোথিত।

ম্যাক্সমুলারের 'আর্যদের ভারত আগমন নীতি'র সূত্র ধরে যখন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যা করা হয় তখন বিষয়টাগুলিয়ে যায়। উল্টো দিক থেকে যদি আমরা পৃথিবীর অন্যতম আদি সভ্যতা হিসাবে রাঢ়কে প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে তখন আমরা জোর দিয়ে বলব, যে এই রাঢ়ভূমি থেকেই আদিম মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গেছে। সে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীই হোক, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান হোক কিংবা মেসোপটেমিয়া সভ্যতার প্রাচীন মানুষেরাই হোক। অনেকেই বলবেন, বললেই তো হবে না, যুক্তি আর তথ্য সহযোগে বিষয়টি প্রতিপন্ন করতে হবে।

রাঢ় সভ্যতার অন্যতম একটি নিদর্শন হলো পোড়া মাটি। পোড়া মাটির শিল্প যে এখান থেকেই পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল তার বড়ো প্রমাণ মেসোপটেমিয়ার উরুক অঞ্চলে খ্রিষ্টপূর্ব আড়াই হাজার অব্দে 'গিলগামেসের মহাকাব্য' পোড়া মাটির প্লেটে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। আমাদের আদিম শিল্পীরা পাথর পাননি, পেয়েছিলেন মাটি, সেই মাটিতেই তারা শিল্পের সাক্ষর রেখেছেন। মাটির হাঁড়ি-কলসীর টুকরো তো ১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মেসোলিথিক পিরিয়ডের, যা আমরা অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা মঙ্গলকোটে অনেক পেয়েছি।

রাঢ়ের কেন্দ্র অর্থাৎ দুর্গাপুরের কাছে দামুদর নদীর তীরে বীরভানপুরে প্রায় ৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে। নিওলিথিক পিরিয়ডে সূক্ষ্ম পাথরের অস্ত্র পাওয়া গেছে। পানাগড় রেলস্টেশনের চারকি কথাও পেয়েছি। এছাড়া সাঁওতালডাঙা, তুলসীপুর, শ্রীপুর, পাণ্ডুরাজার টিপি এসব তো আছেই। বর্ধমান জেলার আউশ গ্রামে ঢিবি খননের ফলে যে সব তথ্যাদি পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে গবেষকরা বলছেন, প্রায় বারশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে একটা উন্নত সভ্যতা ছিল বলে মনে করা যায়।

বিজ্ঞানের দিক থেকে ব্যাপারটা যাঁরা ভাবেন তাদের মনে এই প্রশ্নটাই আসে, যে বিজ্ঞানের এত উন্নতিতেও কেন রক্তসংক্রান্ত আরো উন্নত পরীক্ষা করা হচ্ছে না? রক্তের কয়েকটি শ্রেণির উপর ভিত্তি করে, একের রক্ত যদি বেমালুম অনেকের দেহে খাপ খেয়ে যায় তা হলে মানুষের সম্পর্কসূত্র নিশ্চিতরূপে আরও ঘনিষ্ট, এমন সিদ্ধান্ত করা চলে। মনে হয় আজকের পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেকটি আদিবাসী গোষ্ঠির মানুষের উন্নততর কোনো ডি. এন. এ. টেস্ট করা হয় তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে, আমাদের এই রাঢ়ভূমির অস্ট্রিক গোষ্ঠির মানুষের সঙ্গে তাদের বেশ মিল আছে। অনেকেই এই খবরটা জানেন, যে আমেরিকার ইউনিভারসিটি অব ওয়াশিংটন থেকে একজন জিন-বিজ্ঞানী মাইকেল জে. বামশদ (Michael J. Bamshad) এ বিষয়ে ২০০১ সালের ২১ মে একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এই ধরনের পরীক্ষায় যথাযথভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব যে আমরা কে কোন মূল গোষ্ঠিজাত মানুষ।

সুতরাং ঐতিহাসিকদের সূত্র ধরে আর আমরা বলব না যে, অস্ট্রিকরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিল। বরং আমরা বলতে শুরু করি, যে সভ্যতার অন্যতম আদি বিন্দু রাঢ় থেকেই তারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অতুল সুর তার 'প্রাগৈতিহাসিক ভারত' গ্রন্থে লিখেছেন— 'পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে খুব সম্ভবত (Gunz-Mindel) তুষারযুগের অন্তবর্তীকালে। তার আগের ২০০ লক্ষ বৎসরকাল ধরে প্রকৃতির কর্মশালায় চলেছিল এক বিরাট পরিবর্তন। এক শ্রেণির বানর জাতীয় জীবগণ (Dryopithecus) চেষ্টা করছিল বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত হয়ে নানা বৈশিষ্ট্যমূলক শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হতে। এরূপ এক শাখা যেকেউব পরিণত হয়েছিল নরাকার জীবসমূহে (Primates)। এ সব জীবের মধ্যে যারা বৃক্ষ ত্যাগ করে ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাদের অন্যতম এক শ্রেণি রামপিথেকাস (Ramapithecus) থেকেই পরে মানুষ উদ্ভূত হয়েছিল। ১২০ লক্ষ বছর পূর্বে রামপিথেকাসের বসতি ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের শিবালিক শৈলমালায় এবং তাদের জ্ঞাতি ভাইদের বসতি ছিল চীনের কেইয়নে (Keiyun) ও আফ্রিকার কেনিয়ায় (Kenya)। তবে তাদের মধ্যে রামপিথেকাসই সব চেয়ে প্রাচীন। রামপিথেকাসের পরবর্তী প্রজন্মের নাম দেয়া হয়েছে অস্ট্রালোপিথেকাস (Australopithecus)। রামপিথেকাস যেমন আফ্রিকা ও চীন দেশ পর্যন্ত গিয়েছিল, অস্ট্রালোপিথেকাস তেমনি এশিয়ার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত জাভা পর্যন্ত গিয়েছিল। এরূপ জীবের অস্থি আমরা পেয়েছি জাভার সানগিরানে, আফ্রিকার তানজানিয়ার অন্তর্গত

ওলড়ভালের গিরিসঙ্কটে ও গারুসিতে, কেনিয়ার বাবিনগা ও লোথামে, দক্ষিণ আফ্রিকার টাউঙ, মাকাপন, সোয়াট্ক্রনস ও স্টাকফনটেনে।' দুপায়ে হাঁটতে পারে এমন মানুষের কঙ্কাল-জীবাশ্ম 'লুসি'-কে আমরা ইথোপিয়ায় পেয়েছি। কিম্বা চিনের 'পিকিং' মানুষ পেয়েছি। কিন্তু মূলত মাটির দেশ হওয়ার কারণে বাঙালির উৎসভূমি রাঢ়ের প্রাচীন মানুষের জীবাশ্ম আজও আবিষ্কৃত হয়নি। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের অন্যতম দুজন সেরা দার্শনিক কপিল ও পতঞ্জলির জন্ম হয়েছিল এই রাঢ় ভূমিতেই। পুরুলিয়ার ঝালদার কাছে কোনো এক গ্রামে জন্ম হয়েছিল কপিলমুনির, আর পূর্ব বর্ধমানের দেনুড় (চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবনদাস এবং চৈতন্যের সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতীর জন্মস্থান)-এর কাছে পাতুন গ্রামে জন্ম হয়েছিল মহর্ষি পতঞ্জলির। গাছের শিকড়ে ঢেকে দেওয়া একটি শিবমন্দিরকে পতঞ্জলির জায়গা বলে অনেকে মনে করেছেন। কিন্তু কপিলের জায়গাটি এখনও চিহ্নিত হয়নি। তা নৃতাত্ত্বিক গবেষণা সাপেক্ষ।

গঠনগত দিক থেকে শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে আমাদের অনেকের মিল আছে। আমাদের সবার শারীরিক গঠন-প্রকৃতি সমান নয়। অসমান হলেও আবার জিন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনে আমাদের চেহারা ও অবয়বগত কিছু সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য পাই মাথার চুলে, মাথার আকৃতিতে, গায়ের রং-এ, দৈর্ঘ্যে, মুখের গঠন, নাকের গঠন, কিম্বা রক্তের বর্গে, যাকে ব্লাড গ্রুপ বলা হয়। চুলের দিক থেকে যেমন মঙ্গোলীয়দের সোজা চুল, নিগ্রোদের কোকড়া চুল, অস্ট্রিকদের ঢেউ খেলানো চুল ইত্যাদি ইত্যাদি। গভীরভাবে চর্চা করলে আমাদের বেশির ভাগের গায়ের রং আর চুলই বলে দেয় আমরা সুদূর অতীতে অস্ট্রিক গোষ্ঠীজাত কোনো মানুষের বংশধর।

কথা বলার ঢঙ অর্থাৎ উচ্চরব নিম্নরব ধরেও একটা পার্থক্য টানা যায়। চিনারা আর জাপানিরা প্রায় একই রকম দেখতে, কিন্তু পার্থক্য করা যায় তাদের কথা বলার ঢঙ দেখে। চিনারা অপেক্ষাকৃত উচ্চরবে কথা বলে, যেন রেগেই আছে, আর জাপানিরা নিম্নরবে কথা বলে। গলার স্বরেই প্রমাণ দেয়, জাপানিরা সহনশীলতার প্রতিমূর্তি।

১৯০১ সালে ভারতে লোকগণনার সময় হার্বার্ট রিজলির নেতৃত্বে প্রথম বিভিন্ন জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ করা হয়। পরে ১৯৩১ সালে লোকগণনায় নিযুক্ত চিফ কমিশনার হাটন বিষটি নিয়ে নতুনভাবে আলোকপাত করেন। 'নিগ্রোবটু' নিয়ে একটা তর্ক থাকলেও বলা হয় ভারতে প্রথম আদি অধিবাসী ছিলেন 'আদি-অস্ত্রাল' বাসীরা।

অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আদি-অস্ত্রালদের মিল আছে। মনে হতে পারে, এমনটা কেন? আনুমানিক ৩০,০০০ বছর আগে বরফের যুগের পরেই যখন বরফই গোটা পৃথিবীকে এক করে রেখেছিল অর্থাৎ সাগরের জল তখন জলবৎ তরল ছিল না সেই তখন এরা প্রাচীন ভারত থেকেই সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, মেলানেশিয়া হয়ে দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া, আর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। মহেঞ্জদারোয় এদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। শ্রীলঙ্কায় ভেড়া আর মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে কোল, ভিল, মুণ্ডা, হো, মহালী, করমালী, শবর, পাহাড়িয়া, বেদিয়া, চেঞ্চু, কুরুব প্রভৃতি আর পূর্ব

ভারতে সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ড প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষ আজও বসবাস করে। এদের ভাষা অষ্ট্রিক। এঁরাই ভারতের আদিম অধিবাসী। বেঁটে, গায়ের রং কালো, আর মাথা লম্বা থেকে মাঝারি, নাকের নিচের দিকটা চওড়া ও চ্যাপটা, চুল ঢেউ খেলানো। তবে প্রাচীনতার দিক থেকে কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে প্রাচীন রাঢ় থেকেই এঁরা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ বলছে, যে ভারতের সব ভাষাতে অষ্ট্রিক শব্দের ব্যবহার থাকলেও রাঢ়বঙ্গের বাংলা ভাষাতেই সব থেকে বেশি অস্ট্রিক শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঝাটা, ঝিঙ্গে, ঝোল এসব তো আছেই। আছে প্রচুর ধন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার। আর 'কুড়ি' সংখ্যাকে মাত্রা ধরে গোণাগুন্তি করা। 'রাঢ়' শব্দটাই অষ্ট্রিক। তাই রাঢ় অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা।

প্রাচীনতার দিক থেকে কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে প্রাচীন রাঢ় থেকেই এঁরা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ বলছে, যে ভারতের সব ভাষাতে অষ্ট্রিক শব্দের ব্যবহার থাকলেও রাঢ়বঙ্গের বাংলা ভাষাতেই সব থেকে বেশি অস্ট্রিক শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঝাটা, ঝিঙ্গে, ঝোল এসব তো আছেই। আছে প্রচুর ধন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার। আর 'কুড়ি' সংখ্যাকে মাত্রা ধরে গোণাগুন্তি করা। 'রাঢ়' শব্দটাই অষ্ট্রিক। তাই রাঢ় অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা।

আর্যবাদী নৃতাত্ত্বিকদের মতে এরা বাইরে থেকে প্রথমে প্রাচীন ভারতে এসেছিলেন। মুখের ভাষা দ্রাবিড় ছিল বলে দ্রাবিড় নামে পরিচিত। বৈদিক সাহিত্যে এদের 'পনি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আদি মিশরীয়দের সঙ্গে এদের মিল আছে। মহেঞ্জদারোয় আদি-অস্ত্রালদের সঙ্গে এদেরও কঙ্কাল পাওয়া গেছে। হরপ্পায় আবিষ্কৃত নারী মূর্তিটি ভূমধ্য-দ্রাবিড় বংশীয়। দেহের আকার মাঝারি, লম্বা মাথা, পাতলা গড়ন, নাক ছোটো, আর গায়ের রং কালো। দক্ষিণ ভারতে এদের বিস্তার। বর্তমানে মূলত তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কানাড়ি ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের পূর্বপুরুষ এঁরা। অসলে এরা বাইরে থেকে আসেননি। এরাও ভারতভূমির আদিম সন্তান।

ভারতে প্রথম বহিরাগত হলেন আলপীয়রা। এরাই আর্য। নৃতাত্বিকদের মতে এশিয়া-মাইনর থেকে পশ্চিম উপসাগরের উপকূল ধরে এদের একটি শাখা উত্তর-পশ্চিম ভারতের আফগানিস্তান-পাকিস্তান পথে এদেশে প্রবেশ করে। ভাষাবিদরা বলছেন, বর্তমান রাশিয়ার ইউরাল হ্রদ অঞ্চল থেকে এঁরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এদের ভাষা ছিল আর্য।

তাই এরা আর্য নামে পরিচিত। হরপ্পা- মহেঞ্জদারোর উন্নত সভ্যতা ধ্বংস করে এবং তা দেখে এঁরা সভ্যতা গড়ে তোলার উৎসাহ পায়। এদের একদল সিন্ধু উপত্যকা, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের দিকে আর এক দল গঙ্গার অববাহিকা ধরে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। দৈহিক গড়নের দিক থেকে গায়ের রং ফর্সা ও বাদামি, গোল মাথা, চুল ও চোখ কালো, দেহ মাঝারি ও দীর্ঘ। বৈদিক সাহিত্যের অনুযায়ী এঁরা এক সময় 'অসুর' নামে পরিচিত ছিল। আর উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসে ২০০০- ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই গোষ্ঠীর যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন তারা আর্য ভাষাভাষী নর্ডিক গোষ্ঠী। একই গোষ্ঠীজাত হলেও এঁরা অসুরদের সহ্য করতে পারেনি। নাক লম্বা, ফর্সা, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী এই গোষ্ঠীর লোকেরা বেদ রচনা করে।

হিন্দু ধর্মের যে বর্ণ ও আশ্রম বিন্যাস তা ঋগ্বেদের যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুরুষসূক্তে (১০। ৯০)। দ্বাদশ ঋকে আছে পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, দুই বাহু থেকে রাজন্য তথা ক্ষত্রিয়, দুই উরু থেকে বৈশ্য এবং দুই চরণ থেকে শূদ্রের উদ্ভব হয়। ঋগ্বেদের অন্যত্র জাতিভিত্তিক বিভাগ হিসাবে দুটি মূল ভাগ আর্য ও দাসের কথা বলা হয়েছে। পরে দাস ও শূদ্র এক অর্থেই ব্যবহার করা শুরু হলো।

ভারতে মোঙ্গল শাসকেরা বাইরে থেকে এসেছিলেন সত্য। কিন্তু ভারতে কি এই গোষ্ঠীর লোকেদের অস্তিত্ব ছিল না? অবশ্য ছিল। প্রত্ন-মোঙ্গলীয় মানুষের অস্তিত্ব আজও মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, অরুণাচল, আসামে দেখা যায়। বেদে এদেরকে 'কিরাত' বলা হয়েছে। লেপচা, মেচ, ভুটিয়া, রাভা, চাকমা ইত্যাদি গোষ্ঠী আজও টিকে আছে। দৈহিক গড়নে উচ্চতা মাঝারি, গায়ের রং মূলত বাদামি ও পীত বর্ণের, নাক চ্যাপ্টা, ছোটো ছোটো চোখ, মাথা বাদে এদের দেহ লোমহীন প্রায়। নৃতত্ত্বের ভিত্তিতে এটা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত, যে বাঙালি মিশ্রজাতি। মূল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিশ্রণে বাঙালির উদ্ভব ঘটেছে। বিবর্তনের পথে একসময় কৌমভিত্তিক সমাজে বাগদি, হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত ইত্যাদিরা ছিলেন এই সমাজের মধ্যমণি। পালরাজাদের আমলে প্রথম দিকে এরা কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারলেও সেন যুগে এদের আর্যীকরণ ঘটে। মনে রাখতে হবে, সেন বংশের রাজারা কর্ণাট প্রদেশ অর্থাৎ বাইরে থেকে আসা বাংলার শাসক। তাদের নির্দেশে অনুলোম অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মহিলার বিয়ে এবং প্রতিলোম অর্থাৎ উচ্চবর্ণের মহিলার সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের বিয়ের জন্যই মূলত এই মিশ্রণ আরও বেশি করে ঘটে। ব্যাপকভাবে সংকরায়ণের ফলে নাপিত, মোদক, রজক, স্বর্ণকার, চণ্ডাল, চর্মকার ইত্যাদি প্রায় ৪১টি বর্ণ ও উপবর্ণের মানুষদের পাওয়া যায়। এই সব প্রান্তিক মূলনিবাসী মানুষের সমগোত্রীয় হলেন বাঙালি মুসলমানরা। আমরা এই নিম্নবর্গীয় আর বঙ্গীয় মুসলমানরা যে সব এক, তার নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।

নৃতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে প্রাক্ ইতিহাসের যুগে ভারতবর্ষের প্রথম মানুষ হিসাবে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষেরাই ছিলেন, যাদের সংখ্যা আজ ভারতবর্ষে ২২ কোটিরও বেশি।

ভারতবর্ষের প্রথম মানুষ হিসাবে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষেরাই ছিলেন, যাদের সংখ্যা আজ ভারতবর্ষে ২২ কোটিরও বেশি। ভারতবর্ষ তাদেরই আদি বাসভূমি। তাই তাদেরকে নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে এই জন্য, যে তারা 'আদিবাসী' বা মূলনিবাসী। অথচ আজও তারাই ভারতবর্ষে সব থেকে বেশি বঞ্চিত। সেই গোষ্ঠী কেন্দ্রিক লড়াইয়ে অর্থাৎ আর্যদের কাছে হেরে যাওয়ার পর আজও সমানভাবে অবহেলিত। প্রায় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক শবরপা লিখেছিলেন —'উচা উচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।' গ্রামের প্রান্তে বা পাহাড়ের টিলায় ছিল তাদের বাস। রাতের অন্ধকারে সমাজের নাক উঁচু মানুষেরা এই অন্ত্যজ নারীদের দেহ-উপভোগ করতে পছন্দ করলেও দিনের বেলায় ডোম, শবর, চণ্ডাল ইত্যাদি মূলনিবাসীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতো তারা।

ভারতবর্ষ তাদেরই আদি বাসভূমি। তাই তাদেরকে নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে এই জন্য, যে তারা 'আদিবাসী' বা মূলনিবাসী। অথচ আজও তারাই ভারতবর্ষে সব থেকে বেশি বঞ্চিত। সেই গোষ্ঠী কেন্দ্রিক লড়াইয়ে অর্থাৎ আর্যদের কাছে হেরে যাওয়ার পর আজও সমানভাবে অবহেলিত। প্রায় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক শবরপা লিখেছিলেন —'উচা উচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।' গ্রামের প্রান্তে বা পাহাড়ের টিলায় ছিল তাদের বাস। রাতের অন্ধকারে সমাজের নাক উঁচু মানুষেরা এই অন্ত্যজ নারীদের দেহ-উপভোগ করতে পছন্দ করলেও দিনের বেলায় ডোম, শবর, চণ্ডাল ইত্যাদি মূলনিবাসীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতো তারা। স্বাধীনতার আগে ইংরাজ শাসক ও জমিদার দ্বারা আর স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে তারা। সভ্যতার আলো দেখতে দেওয়া হয়নি তাদের। তার জন্যই তো হুল বা বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ।

একদিন অভিমানবশতই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষেরা অরণ্যকে বাসভূমি হিসাবে বেছে নিয়েছিল। তারপর একদিন (১৮৬৫) তাদেরকে ওই অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে ব্রিটিশ সরকার অরণ্য আইন প্রণয়ন করে। এতে জমি জঙ্গলের উপর তাদের চিরায়ত অধিকার হারায় অস্ট্রিকরা। রুজিতে টান পড়ে তাদের। অনেকে বেছে নিতে বাধ্য হয়, শ্রমে ঘাম ঝরানোর পথ। কেউ কেউ তাদের বলে চুয়াড়। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ-অরণ্যে বসবাসকারী, জমিদারের রক্ষী বা পাইক। আসলে ডোম, মুচি, মেথর, কোড়া, মুণ্ডারি, কুর্মি,

মাছি, লোধা, সাঁওতাল, শবর ইত্যাদিকে এক পাতে ফেলে ঘৃণাসূচক মন্তব্য হল চুয়াড়। মঙ্গলকাব্যে এর সমর্থনে আছে। এই বঙ্গভূমির লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'কেহ না পরশ করে জাতিতে চুয়াড়'। মঙ্গলকাব্যগুলো পর্যালোচনা করলে সেখানে মূল নিবাসীদেরই যারা দেবতা, তাদের প্রাধান্য। লোকদেবতা যেখানে ডোম সমাজের কথা অর্থাৎ মূল নিবাসীদেরই কথা রয়েছে তারাই বাংলার প্রাচীন সেনা। তাদের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি। তাই আজ আমাদের যদি কেউ 'চুয়াড়' বলে তো আমরা গর্ব অনুভব করবো। আসলে সভ্যতার আদি বিন্দু রাঢ় ধরে আমরা সব রাঢ়ী। প্রাচীন সভ্যতার মানুষ।

সাম্প্রতিক কতকগুলি আবিষ্কার রাঢ়ের প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে। উৎখননে আবিষ্কৃত হয়েছে — পাণ্ডুরাজার ঢিবি, চন্দ্রকেতুগড়, ভরতপুর ইত্যাদি। এইসব জায়গায় যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু পাওয়া গেছে তার থেকে প্রমাণ হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এই সভ্যতা বর্তমান ছিল। গ্রিক ইতিহাসে গঙ্গারিডি বলে যে প্রাচীন সভ্যতার কথা বলা হয়েছে তা আসলে এই রাঢ় সভ্যতা। এখান থেকেই সম্ভবত সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল হরপ্পা-মহেঞ্জদারোতে। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে তাই আজ এটাতে বিশ্বাস রাখার দিন এসেছে, যে সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী নয় অস্ট্রিক ভাষাই হলো প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষার জননী।

দেবতা প্রমাণ

পৃথিবীর আদি দেবতা সূর্য। অস্ট্রিক সমাজে তিনি হলেন সিঞ বোঙ্গা। বিশ্বের সব কিছুই তার উপর নির্ভরশীল। অস্টিক গাষ্ঠীর অনেক মানুষের পদবীতে সিং লেখা হয়। যেমন মনসারাম সিং, কাঞ্চন সিং সর্দার। এই সিং আসলে সিঞ। অর্থাৎ সূর্য বংশ। আশ্চর্য হতে হয়, এই নামগুলোর সঙ্গে রাম শব্দের এত যোগ দেখে। যেমন অলচিকির সৃষ্টি কর্তা রঘুনাথ মুর্মু এই সমাজের আধুনিক পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব রামদাস টুডু, সাধু রামাদ মুরমু প্রমুখ। রাম ছিলেন তীর ধনুকধারী। গায়ের রং শ্যামলা। তিনিও সূর্য বংশের। এই কল্পিত রাম কোন্ রাম? উইপোকা বা বল্মীক নিশ্চই পাহাড়ে কম থাকে, বেশি থাকে মাটি অধ্যুষিত এই রাঢ় ভূমিতেই। ব্রাহ্মণ্যবাদই কি তাহলে সব গুলিয়ে দিল?

যাই হোক, মুণ্ডা সমাজে সমস্ত প্রকার কুসংস্কার দূর করার জন্য বিরসা মুণ্ডা একেশ্বর সাধনার কথা বলেছিলেন। সেই একমাত্র ঈশ্বর হলেন সিংবোঙা। তবে তাকে কেন্দ্র করেই অস্ট্রিক সমাজে একাধিক সিঞবোঙার নাম পাওয়া যায়। যেমন — গৃহদেবতা 'অড়া বোঙা', পথের দেবতা 'ডাহার বোঙা', শস্যের দেবতা 'শ-শ বোঙা'। প্রাচীন গ্রীসে বা প্রাচীন মিশরেও এরকম শস্যের দেবতা পাওয়া যায়। গ্রীসে দিওনিসিওসের গল্প আমরা জানি। এই দিওনিসিওস ইংরাজি সাহিত্যে ডায়োনিসাস। যার দুবার জন্ম হয়েছিল। একবার মাতৃগর্ভ থেকে আর একবার দেবরাজ জিওসের জঙ্ঘা প্রদেশ থেকে। তার দুবার জন্ম নিয়েই দ্বিথুরাম্ব গান, সেখান থেকে কোরাস। কোরাসে প্রথম একক অভিনেতার আমদানি করলেন থেসপিস। কোরাস প্রসারিত হল। শীতকালে ফসল পাকাকে কেন্দ্র করে আনন্দ

উৎসবের সূচনায় জন্ম হলো শোভাযাত্রীর দল 'কোমাস' শব্দ থেকে কমেডির। আর বসন্তকালে ফসল ঘরে তোলার প্রেক্ষিতে জন্ম হল ট্রাজেডির। দিওনিসিওসের অনুচর তথা তার সামনে বলি দেওয়া ছাগল 'ট্রাগোদিয়া' থেকেই ট্রাজেডি শব্দ।

আগেই বলা হয়েছে, সম্ভবত ভারত থেকেই মানুষ মিশরে গেছেন। গিলগামেসের পোড়ামাটির উপর লেখা কাব্য তার বড় প্রমাণ। আমাদের রাঢ়ভূমিতে পাথর কম, মাটি বেশি। শিল্প-সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে তাদের অন্যতম অবলম্বন পোড়ামাটি। এই মিশরে শস্যের দেবতা হলেন নীলনদের দেবতা ওসিরিস, যিনি আবার পরকালের বিচারক ও পুনর্জন্মের দেবতা। যে মিশর বা ইজিপ্ট ৫০০০ বছর আগেকার সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী। প্রকৃতি থেকেই দেবতা নির্বাচন। একটা ভূখণ্ড থেকে আর একটা ভূখণ্ডে গেলে কিছুটা তফাৎ থাকবেই। তবে লক্ষ করলে দেখা যাবে শ-শ বোঙা, দিওনিসিওস ও ওসিরিস এই তিন দেবতার নামের মধ্যেই শিশ ধ্বনি লুকিয়ে আছে।

ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দাদের পুরাণ কাহিনি লিখতে গিয়ে রামদাস টুডু লিখছেন, যে কারু এবং ধারু দুই ভাই। কারু কারাম বা করম গাছের ডাল পুঁতে প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা জানায়, ধারু এসব পছন্দ করে না। কারু কারাম গাছ তুলে ফেলে দেয়। এই নিয়ে দুই ভাইয়ের বিচ্ছেদ দেখা দেয়। তারপর একসময় ধারু নিঃস্ব হয়ে পড়লে বাধ্য হয়ে একদিন সেও কারামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার সব কিছু ফিরে পায়। ভাইয়ে ভাইয়ে এই বিচ্ছেদ ও মিল আজও অব্যাহত। কারাম আসলে কৃষি কাজেরই ব্রত। কারাম বা করম শব্দে স্বরলোপ ঘটে হয়েছে কর্ম।

রাঢ়ে সূর্যপূজার প্রচলন আছে। ধর্মঠাকুর সূর্যের অন্যরূপ। অস্ট্রিকরাও তাকে মানে। কালো কৃষ্ণ গায়ের রং গঠন কাঠামোর দিক থেকে রাঢ়ীদের সঙ্গেই মিলে যায়। তাকে অনার্য সম্ভূত বলেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শিব আমাদের কাছের মানুষ। চাষিবাসী মানুষ। রাঢ়ের শৈবধর্ম অনেকটাই তন্ত্র আশ্রয়ী। মারাংবুরুই হয়েছেন শিব। শক্তির দেবী কালী কোনোভাবেই আর্য সদ্ভূত নয়, তিনি আসলে রাঢ়েরই শক্তি দেবী।

কৃষ্ণ অনার্য সদ্ভূত। ঈশ্বর আরাধনায় প্রাচীন অস্ট্রিকরা ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতের সাহায্য নিতেন না। 'পোহান' নামক কিষাণ সম্প্রদায়ের হাতে তারা ব্যাপারটা ছেড়ে দেয়। বৌদ্ধদের শূন্য সাধনার উৎস এটাও হতে পারে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বড়ো কাজ করেছিল সাধারণ মানুষের ভাষা পালি। পালি ভাষায় বক্তব্য প্রচার আর না খেয়ে থাকা মানুষের জন্য কৃচ্ছ-সাধনার কথা প্রচার করেছিলেন বুদ্ধদেব।

অস্ট্রিকদের করম বা কারাম ব্রত প্রকৃতি নির্ভর আরাধনা। কারা > করম > কর্ম শব্দের উৎপত্তি হলে উপনিষদ বা গীতায় যে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে তার মূল হিসাবেও দুই ভাইয়ের এক ভাই কারু সম্পর্কিত। হয়তো কুরুক্ষেত্র (কারু > কুরু + ক্ষেত্র) শব্দটি সেই অর্থে কর্মময় জীবনের সংগ্রামস্থল রূপেও বিবেচিত হতে পারে।

সাংস্কৃতিক প্রমাণ

সুবর্ণরেখা, দামুড়হুড়া বা দামুদর নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, কিন্তু আদিম সংস্কৃতি নিয়ে তেমন কোনো কাজ হয়নি। অস্ট্রিক সংস্কৃতি নিয়ে ইদানিং চর্চা হলেও আগে তো কিছুই হয়নি। তাই অভিমান করে বলা হয়েছে —'একজন সাঁওতাল ছেলেকে পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি লেখকের লেখা। কিন্তু একজন বাঙালি ছাত্র জানতেও চায় না—রামদাস টুডু, সাধু রামাদ মুরমু, পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু প্রভৃতি লেখকের নাম।' অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর উপর বাংলা ভাষার প্রভাব আছে—সেগুলোর স্বীকৃতি তো নেই-ই, বাংলার স্কুল কলেজে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাও নেই। কারা যেন অষ্ট্রিক সংস্কৃতির বিকাশের ধারাকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করে চলেছে। এই অভিমান আজও সত্য।

সংস্কৃতির দিক থেকে আজকের বাঙালি যে সংস্কৃতি পালন করছে তা দীর্ঘ দিন ধরে বিবর্তিত হয়েছে। একটা মিশ্র রীতিই আজকের বাঙালি সংস্কৃতি। তবে তার অনেকাংশে আদিম রাঢ়ের সংস্কৃতি যে জড়িয়ে আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসের আরাধ্য দেবী ছিলেন বাসলী। তাকে শক্তির দেবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবী বাসলীরা সাত বোন, তাদেরকে কেন্দ্র করেই সাতটি ভিন্ন স্থান আছে। রাঢ় বাংলায় এই বাসলী বা বাসুড়ি দেবীকে চণ্ডীর প্রাচীন রূপ বলে মনে করা হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে লৌকিক দেবী বাসুলী পূজা আদিম সমাজের 'Aptishism' বা প্রস্তরোপাসনার প্রবৃত্তিজাত। গবেষক ও'ম্যালির (O'Malley) মতে এই দেবতা আসলে শান পাথর। চণ্ডীদাসের বাসুলীর তেমন কোন মূর্তি নেই। ছাতনার দুবরাজপুরে বাসুলী আবার দ্বিভূজা। কোথাও বা কালীর মূর্তির সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কোথাও কোথাও তিনি জয়চণ্ডী নামেও পূজা পান। অস্ট্রিক সমাজে জাহের হলেন শক্তির দেবী। তার পরে চাণ্ডী বা চুণ্ডী নামক দেবীর আবির্ভাব ঘটে। খেরোয়াল বংশাঃ ধরম পুথিতে কালসিনি, কালচুণ্ডী, নাশনচুণ্ডী, শ্মশানচুণ্ডী, শুকামচুণ্ডী, শঙশচুণ্ডী, যোগিনীচুণ্ডী, মশানচুণ্ডী প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। এঁদের যে সব মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে তা ভয়ঙ্কর মূর্তি। চণ্ড শব্দের আদি অর্থ হলো শক্ত, রূঢ় বা কঠিন। রূঢ় আচরণের জন্যই সম্রাট অশোক চণ্ডাশক নামে পরিচিত ছিলেন। চণ্ডের স্ত্রীলিঙ্গ চুণ্ডী থেকে চণ্ডী শব্দের উৎপত্তি বলে মনে হয়।

বাঙালিরা বেড়াতে ভালোবাসেন। বাঙালির উৎসমূল যে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ তার সাংস্কৃতিক প্রমাণ পাওয়া যায়। পথে-ঘাটে যারা বোঁ বোঁ করে ঘুরে বেড়ায় তারা বোঙা নামে পরিচিত। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষের কাছে পথের যে বোঙা তিনি হলেন 'ডাহার বোঙ' বা পথের দেবতা।

আমরা এখন যে গালাগালের শব্দ হিসাবে 'বেদো' শব্দটা প্রয়োগ করি অর্থাৎ যার জন্মের ঠিক নেই। শব্দটির উৎপত্তি বেদিয়া শব্দ থেকে। বেদিয়া এক অর্থে যাযাবর। আর্যদেরকে বেদিয়া বলা হতো। তাহলে তাদেরকে অনার্যরা কি বেদো বলতো? হা, লোকায়ত

শব্দ প্রয়োগগত লিখিত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া মুশকিল। কিন্তু শব্দগুলো নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।

আসলে আর্যামীর ব্যাপারটিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগের জন্য ম্যাক্সমুলারকে দায়ী করা যেতে পারে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ম্যাক্সমুলারের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন ম্যাকলে। ম্যাকলের স্বপ্ন ছিল ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষের মানুষকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন — 'It is my belief that if our plans of education are followed up– there will not be a single idolator among the respectable castes in Bengal thirty years hence. SThe Life and Letters of Lord Macaulay by Rt. Honible Sir George Otto Trevelayan– Bart. pp. 329-330– from the book– Max Muller Exposed.' p.-4"

সেই plans of education এর একটি পরিকল্পনা হল আর্য জাতির অহং প্রতিষ্ঠা। Brahma Dutt Bharati লিখিত Max Muller Exposed গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে ম্যাক্সমূলার বলেছেন —

'This edition of mine and the translation of the Veda will hereafter tell to a great extent on the fate of India - it is the root of their religion and to show them what the root is, I feel sure, it is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last three thousand years (1866).' Life and Letters of Frederick Max Muller, from Max Muller Exposed - P. 11.

অনুবাদ করলে এরকমটা দাঁড়ায় — আমার অনূদিত বেদ ও তার সংস্করণ ভবিষ্যতে ভারতের ভাগ্যকে বিস্তৃতভাবে নির্ধারিত করবে। কারণ, এটাই হল তাদের ধর্মের উৎস এবং তাতে বলা হয়েছে তাদের ধর্মের মূল কী। আর আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি এটাই হবে একমাত্র পদ্ধতি যা এদের তিন হাজার বছরের সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে নির্মূল করে দিবে।—মনে রাখতে হবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশেই ম্যাক্সমুলার সায়নাচার্যের ভাষ্যসহ ঋগ্বেদের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর

আমরা এখন যে গালাগালের শব্দ হিসাবে 'বেদো' শব্দটা প্রয়োগ করি অর্থাৎ যার জন্মের ঠিক নেই। শব্দটির উৎপত্তি বেদিয়া শব্দ থেকে। বেদিয়া এক অর্থে যাযাবর। আর্যদেরকে বেদিয়া বলা হতো। তাহলে তাদেরকে অনার্যরা কি বেদো বলতো? হা, লোকায়ত শব্দ প্রয়োগগত লিখিত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া মুশকিল। কিন্তু শব্দগুলো নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।

মধ্যভাগে ম্যাক্সমূলারের এই আর্য-অহং অপরকে প্রভাবিত করেছে এবং অনার্য ভাষা সংস্কৃতিকে ক্রমশ লোপাট করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানসী' কাব্যে 'বঙ্গবীর' কবিতায় বলেছেন 'মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য',/ সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য'।

১৯৯০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম ফিল গবেষক হিসাবে কাজ করেত গিয়ে দেখা গেছে, বর্ধমান জেলায় প্রচলিত মেয়েদের বিয়ের গানের সুর আর খেরোয়াল বংশাঃ ধরমপুথিতে যে সব সূক্ত আছে তার সুর একই— 'নওয়া দ সের্মা আর মঞ্চ পুরীরে-এ যত পাড়া গে-এ/মেনায় বাবা ঈশ্বর গে-এ উনি গে বোন বরো।'... সম্ভবত গে-এ থেকেই বাংলায় সম্বোধন সূচক শব্দ গো এসেছে। বর্ধমানের বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন শৈলেনবাবু। তিনি তার নার্সিংহোমে ফেলে যাওয়া হাসিনাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ায়, বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গীত রচনা করা হয়েছে —'শৈলেন বাবু ডাক্তার বাবু হাসিনাকে বিয়ে করলো গো ...।' আদিরসওয়ালা ছড়া ও গান সংগ্রহের কাজে লিপ্ত আছেন রাঢ়বঙ্গের অন্যতম গবেষক আইয়ুব হোসেন। কাটোয়ার কাছে রাজুয়া গ্রামে থাকেন। ৮৪ বছর তাঁর বয়স। তিনি এই বঙ্গ সংস্কৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর সংগৃহিত একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন—'আমার সঙ্গে কিসের ঠাট্টা ও বকুলের ফুল। নিত্য নুন মাখামাখি তুমি আমারে দাও হে ফাকি। —ওহে শ্যাম গিয়েছিলে কোথা?—গিয়েছিলাম বেনাদের পাড়াতে, সরষে ফুলের চারাতে, সরষেফুল গোব্দাবালী সন্ধে না লাগলে ফোটে না। তোমার সঙ্গে পিরিত করে মনের আশা পোরে না। সারকুরটা হিচতে গেলাম খালি গুগলি পিরিত করা বুকে কেন হাত দিলি। পিরিত করার মন থাকে তো ঘরে কেন না গেলি।'—তাঁর মতে, গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা এই সব আদিরসের ছড়াগুলোর সমাজভাষাতাত্ত্বিক পাঠ নিলে দেখা যাবে যে এর উৎসমূলে বোঙাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতিই লুকিয়ে আছে। 'নুন' শব্দটা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় হয়েছে 'নোনামেয়ে'। 'গোব্দা' মোটা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে এখানে এর অর্থ নব যৌবনাগত নারী। অর্থাৎ লোকায়ত বাংলা ভাষার অনেক শব্দেরই উৎসমূল অষ্ট্রিক ভাষা।

লিপি প্রমাণ

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনতম লিপি হিসাবে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত যে শিলমোহরের লিপি পাওয়া গেছে তা নিয়ে এবং পরবর্তীকালে বহুল প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপি বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য লিপি বিশারদেরা চর্চা করেছেন; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেঃ মার্শাল, সি.এফ গ্যাডগিল, সিডনি স্মিথ, জে. আর হান্টার প্রমুখ। সিন্ধুর অববাহিকায় চিত্রাক্ষর লিপি থেকে মৌর্য আমলের ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী লিপির ইতিহাস পাওয়া যায় তা সুস্পষ্ট নয়। যদিও ল্যাংডেন মনে করেন সিন্ধু লিপি থেকেই আদি ব্রাহ্মলিপির উদ্ভব ঘটেছে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত ডানদিক থেকে বাম দিকে লিখিত খরোষ্টি লিপি ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে ব্রাহ্মীলিপি ভারতবর্ষ ছাড়া সিংহল, বার্মা, তিব্বত, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে যে লিপি বর্তমান তার আদি উৎস। প্রতীচ্যের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা

পালি ও অশোকের শিলালিপিকে ব্রাহ্মীলিপির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছিলেন। কোন কোন গবেষক বিদেশি লিপি থেকে এর উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করলেও তা ধোপে টেকেনি।

নলিনী সান্যাল স্পষ্ট প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে ব্রাহ্মীলিপি কোনো বিদেশি লিপি থেকে উদ্ভূত নয়। আর আজকের যে বাংলা লিপি তারও উদ্ভব ঘটেছে ব্রাহ্মী লিপি থেকে। স্বরের মাত্রার আকৃতি কুটিল বা বাঁকা ছিল বলে এই লিপিকে কুটিল লিপি বলা হত। The Origin of the Bengali Script গ্রন্থে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বাংলা লিপির একটি বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তুলে ধরেছেন। ভারতীয় হস্তলিপি বিদ্যার পথিকৃৎ জর্জের পথ অনুসরণ করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রত্ন-বাংলা লিপির উদ্ভব ঘটেছে উত্তর-পূর্বে এবং তা ঘটেছে দঃ পশ্চিমা নাগরী লিপির উত্তর ভারত জয়ের পূর্বে। অর্থাৎ বাংলা লিপিতে নাগরী লিপির প্রভাব খুব সামান্য। তাঁর মতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সম্পূর্ণ প্রত্ন বাংলা লিপির বিকাশ ঘটে এবং দ্বাদশ শতকের মধ্যে স্বতন্ত্র বাংলা লিপির বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি ২২টি বাংলা বর্ণের আকৃতি দেখিয়েছেন, তুর্কী আক্রমণের আগে ই, চ, ণ প্রভৃতি বর্ণের বিকাশ দেখা যায়নি। প্রায় ১৯ শতক পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের লিপিগুলির পরিবর্তন তেমন একটা ঘটেনি।

এস. এন. চক্রবর্তী ব্রাহ্মীলিপির স্থানীয় সংস্করণ বাংলা লিপিকে আক্ষরিক বর্ণমালার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বলে উল্লেখ করেছেন। পূর্বা রীতিতে ম, হ, ল, এদের উদ্ভব গুপ্ত যুগের আগেই হয়েছিল। গুপ্ত আমলেই উত্তরাঞ্চলের বর্ণমালায় পূর্ব ও পশ্চিমের ভেদ রেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'স' বর্ণের ভিত্তিতে।

হোর্ণেলের মতে, ভারতের উত্তর পশ্চিম বর্ণমালা একসময় উত্তর পূর্বী বর্ণমালার উপর প্রভাব বিস্তার করে। দশম শতাব্দীতে নাগরী লিপি এর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলেই এই শতাব্দীর শেষের দিকে প্রত্নবাংলা লিপির উদ্ভব ঘটে। এর আদি নিদর্শন পাওয়া যায় রাজা প্রথম মহীপালের পুত্র নরপাল বা নয়পালদেবের দানপত্রে। দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে প্রত্নবাংলা লিপি আরও পরিশীলিত রূপ পায়। বিশেষ করে অ, উ, ক, খ, গ, ছ, ধ প্রভৃতি। বাংলায় মৌলিক স্বর ৭টি, সাঁওতালিতে ৬। এখানে 'এ্যা' নেই। ব্যঞ্জন ২৯টি। কিন্তু আমাদের আক্ষেপ, ভাষা নিদর্শন পাওয়া গেল না। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মিশনারিরা এ, ফ্লে ফসরুদ-এর সহায়তায় প্রকাশ করেন 'হড়কো-রে মারে-হাপড়াকো-রেঅঃকাথা' অর্থাৎ 'হড় বা সাঁওতালজাতির পূর্বপুরুষদের ইতিকথা' নামে রোমক লিপিতি একটা বই। সম্ভবত এটিই প্রথম সাঁওতালি সাহিত্য নিদর্শন। বৈদ্যনাথ হাঁসদা এর বাংলা অনুবাদও করেছেন।

ভাষা প্রমাণ

প্রচলিত ধারণা ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পূর্বে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হয়ে প্রথম অষ্ট্রিক গোষ্ঠি এবং পরে দ্রাবিড় গোষ্ঠির মানুষ ও তাদের ভাষার প্রবেশ ঘটে আর উত্তর

পূর্ব সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে ভোটচীনিয় গোষ্ঠির মানুষেরা। এই তিন গোষ্ঠির পরে আর্যদের প্রবেশ ঘটে বলে স্বাভাবিক ভাষা প্রবেশের সূত্র ধরেই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শব্দভাণ্ডারে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠির বিভিন্ন শব্দ স্থানলাভ করে। মনে রাখতে হবে, ভাষার এই প্রভাব দীর্ঘকাল ধরেই মূল শব্দভাণ্ডারে সঞ্চারিত হয়েছে।

বাংলাভাষার উপর অবদমননীতি কার্যকর হয়েছে বারবার। পালযুগেরও আগে এই রাঢ়ভূমিতে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। পরে রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শাসকশ্রেণি প্রভুত্ব বিস্তার করে বাংলা ভাষার উপর। সেন রাজবংশ, শাসকের ভাষা সংস্কৃত, শাসক সংস্কৃত ভাষারই পৃষ্ঠপোষক। তাই ভাষা বিকাশে শাসকের সাহায্য পাওয়া গেল না। পরে মুসলমান শাসনকালে অবস্থার পরিবর্তন হলেও নতুন করে সমস্যা মাথাচাড়া দিল ইংরেজ আমলে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তত্ত্বাবধানে বাংলা শব্দগুলোকে সংস্কৃত উৎসমূল ধরে ব্যাখার চেষ্টা শুরু করলেন সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রেণি।

আজকের বহুল চর্চিত একটি বিষয় পশ্চিমবঙ্গের নাম কি হবে? অনেকেই বলেছেন 'বঙ্গ' নাম থাকুক। একসময় 'বঙ্গ' শব্দটির উৎসমূল খুঁজতে গিয়ে বলা হয়েছিল আরবি-ফারসি 'বঙ্গলাহ' থেকে 'বঙ্গ' বা 'বাংলা' শব্দ এসেছে। কিন্তু এই বক্তব্য ঠিক নয়। আসলে বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি অস্ট্রিক 'বোঙা' শব্দ থেকে। 'বাঙা' অর্থাৎ অশরীরী দেবতা। বোঙা থেকেই বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি। এখনকার বাংলাদেশ < বঙ্গদেশ < বঙ্গা দিশম < বেঙা দিশম। যার অর্থ হল পবিত্র স্থান বা দেবস্থান বা দেবভূমি। নামটা বঙ্গ বা বঙ্গভূমি হলে ক্ষতি কী?

বাংলা শব্দভাণ্ডারের তিনটি প্রধান ভাগ—মৌলিক, আগন্তুক, নবগঠিত। আগন্তুকের একটা ভাগ দেশি। মৌলিকের বিভাগ করা হয়েছে। —তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব। দেশি হল অনার্য। কিন্তু আগন্তুক। কোথা থেকেও সে আসেনি অথচ বাংলাভাষায় সে আগন্তুক? প্রকৃত বিচারে, মৌলিক শব্দ তৎসম বা তৎসম জাত নয়। মৌলিক হল দেশি অর্থাৎ অনার্যভাষা থেকে জাত শব্দ সমূহ। আর আগন্তুকদের দলভুক্ত হবে তৎসম সব শব্দ।

কতকগুলো শব্দ বিশেষ করে লক্ষ করার; যেমন 'অকাট' শব্দটা। আধুনিক বাংলায় 'আকাট' হল মূর্খ। মূল কুরমালি বা সাঁওতালি শব্দ 'অকট'। যার অর্থ করা হয়েছে আদিম, নির্বোধ, অবোধ ইত্যাদি। আদি-বাংলা নিদর্শন চর্যাগীতিতে শব্দটির ব্যবহার আছে— 'অকট জোইআ রে মা কুরু হথা লোহা' অর্থাৎ ওরে, মূর্খ যোগী, (পুরানো মতের ধর্মাচরণে মন রেখে) হাত লোনা (নষ্ট) করো না। বাধা দেওয়া অর্থে বলা হয় 'আটকাও'। শব্দটির সাঁওতালি অটকাও বা আঁটকাউ শব্দ জাত। তাই বাংলায় মৌলিক শব্দ বলতে সাঁওতালি, খেরওলি, কুরমালি এগুলিই হওয়া উচিত; সংস্কৃত জাত শব্দ নয়। সাঁওতালি 'ঞিদী' থেকে 'আঁধার' না অন্ধকার থেকে 'আঁধার' হয়েছে, তা নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে। আমাদের বিচার করতে হবে সংস্কৃত ঋজু > অজ্জ হয়েছে না সাঁওতালি অজ শব্দই এর মূল। অজবোকা, অজপাড়াগাঁ ইত্যাদি কিন্তু দ্বিতীয় সম্ভাবনাকে দ্যোতিত করে। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ে প্রথম শব্দ 'অজ' সাঁওতালি শব্দ। সেই সূত্রে অজগর হল অজ বা ছাগলকে

গলাদ্ধকরণ করে যে। এইভাবে শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বাংলা শব্দের মূল উৎস পাওয়া যায়।

বলা হয়েছে 'সুর' এর বিপরীত শব্দ হল 'অসুর'। কথা হল, কোনটি আগে—অসুর না সুর। কেউ কেউ সুর-এর প্রতিই তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করবেন। সুরাসুর কথাটা তাদের পক্ষে যেতে পারে। কিন্তু বিপরীত ভাবনাটাও উড়িয়ে দেওয়ার নয়। একটা সময়ে কোল গোষ্ঠীর কোনো একটা দল 'অসুর' নামে পরিচিত ছিল। যাদের কাজ ছিল আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশন করা এবং তা থেকে অস্ত্র বা ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরি করা। তারা যে ভাষা ব্যবহার করতেন তার নাম 'অসুরি ভাষা'; যে ভাষার সঙ্গে করমানি বা কামারদের ব্যবহার্য কিছু কিছু শব্দের মিল পাওয়া যায়। অসুর নাম ধারী এই উপজাতি আজকে লোহার বা কর্মালি নামে পরিচিত। ঋগ্বেদে অসুর শব্দের অর্থ নেতা, রাজা, ত্রাণকর্তা। অর্থাৎ তিনি অশুভ বা অমঙ্গলজনক চরিত্র নন। সেই সূত্রে সূর্য হলেন অসুর, তেমনি ইন্দ্র, সোম সবাই অসুর হিসাবে সম্মানিত। বলা হয়েছে — 'হে ইন্দ্র অসুর তুমি জগতের এবং যে সকল দেবতা আছেন তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর।' (১:১৭৮:১)

পুরাণের যুগ থেকে এই 'অসুর' শব্দের অর্থ বদলাতে শুরু করলো। আর্য নামক যাযাবরের দল সমাজব্যবস্থার নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। তারা বললো, অসুর শব্দটি এসেছে অ ধাতু জাত 'অসু' বা 'আসু' থেকে। যার মৌলিক অর্থ শক্তি। অশ বা অস দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক স্তরে জীবনের অভিব্যক্তিকে চালিত করে। সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে জানিয়েছেন অসুর শব্দটি মৌলিক 'ইহার প্রথম অক্ষরকে নঞর্থ উপসর্গ মনে করিয়া বিষমচ্ছেদের ফলে সুর (= দেবতা) শব্দ উৎপন্ন।' বেদে দেখা যায়, প্রথমে সূর্যের প্রাধান্য, পরে ইন্দ্রের। কেন এমন! আসলে ক্ষমতার পরিবর্তন। অসুরদলের লোকায়ত স্থানীয় মানুষের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে নিল বেদেদল অর্থাৎ আর্যরা। সেই অসুরদের একটা দল সম্ভবত চলে গেলেন পারস্যের দিকে; তারা বললো সূর্যোপসনা করো। অস্ত্র ও লৌহনির্মাণের আগ্নি জ্বেলে রাখ। তাদেরই প্রতিনিধি জরাথুস্ট্র লিখলেন জে-আবেস্তা। অর্থাৎ অসুররা আরও ছড়িয়ে পড়লো। তাই বলা হয়েছে—'অসুরা মহতাঃ বা আঠ্রাঃ মজদা — অসুরগণ মহৎ।'

আশ্চর্য অসুর শব্দটির কি পরিণতি! অসুরদের পরাজিত করার জন্য ইন্দ্রের নেতৃত্বে পুরাণে কত চক্রান্ত। সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে অসুর অর্থে প্রাচীনতর বেদ ও আবেস্তায় উল্লেখিত দেবতা একথা স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছে — 'বিঃ হিন্দু পুরাণোক্ত দেবশত্রু জাতি বিশেষ; দৈত্য, দানব'। আসলে আর্যরা শব্দটিকে নিজেদের মতো করে নিয়েছে।

লিঙ্গ বা লাঙ্গুল শব্দটি কোল ভাষা থেকে এসেছে। সাঁওতালী ভাষাতে পুরুষের লিঙ্গকে বলা হয় 'লজঃ'। কৃষি প্রধান অঞ্চলে এই শব্দগুলি এক অর্থে উৎপাদনের প্রতীক। চুচি, চুচু এসব স্ত্রী গোপন অঙ্গের ব্যাপারটা তো আছেই। চোরের সর্দারকে বলে 'চাঁই' বা 'চাই'। কিম্বা গরুর দুধ দোয়ার শব্দ চাই-চুই, চাঙ্গা বা বাচ্ছাদের চলতে শেখানোর সময় চোচো পা

পা সবই অস্ট্রিক সম্ভূত। চো চো হলো কাকা বা খুড়ো, যিনি চলতে শেখান। গ্রামীণ একটি শব্দ 'আড়া'। একস্থানে জল বেঁধে একটা বাঁশের চোং দিয়ে পাশ করানো হয়। আর তার পাশে একটা গর্ত থাকে; তারই নাম আড়া, যা মূলত ফাঁদ। চোং এর ফাকে ঢুকতে না পেরে মাছেরা লাফ দিয়ে এই আড়াতেই পড়ে। এখান থেকেই আধুনিক বাংলায় হয়েছে আড়াগাড়ি, আড়া দেওয়া। গোরুর গোয়ালে যেখানে দরজা থাকে না সেখানে দরজায় গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে আড়াআড়িভাবে ব্যবহৃত বাঁশ; আটক অর্থেও শব্দটির প্রয়োগ আছে। গাড়ির আড়া, যা গরুর গাড়ির কাঠের চাকার বেড় কে মধ্যে থাকা হাঁড়ি নামক কাঠের সঙ্গে ধরে রাখা কাঠ।

সাঁওতালি শব্দ 'দাঃ' মানে জল। এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলো লক্ষ করার — দাক পাখি (জলের পাখি), দাঙা (জল যেখানে সহজলভ্য নয়), দোঙ্গী (জলের উপর যাতে করে ভেসে যাওয়া যায়), দুনি (জল সেচে ব্যবহৃত), দাঙ (জলীয় অংশ শুকিয়ে যাওয়া লাঠি), দাবা (জল ধারণ করার পাত্র)। বর্তমানে এই শব্দগুলি বেশিরভাগই 'ড' দিয়ে লেখা হয়। 'ড' এর উপর সম্ভবত দ্রাবিড় প্রভাব পড়েছে। একটা মূল শব্দ থেকে বদ্ধরূপমূল যোগ করে একের পর এক শব্দ তৈরি হয়েছে।

বহুল প্রচলিত মত ফারসি 'বঙ্গলাহ' থেকে বাংলা শব্দের উৎপত্তি। এটি ঠিক নয়, আসলে অস্ট্রিক বোঙা থেকে বঙ্গ বা বাংলা শব্দের উৎপত্তি। 'বাবা' শব্দটির দিকে একবার তাকানো যেতে পারে। অভিধানে বাবা শব্দটিকে তুর্কি শব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাঁওতালিতে আবা শব্দ আছে। ইতিহাসে পড়ি 'ধরতি আবা' অর্থাৎ ধরতির পিতা। পৃথিবীর পিতা বা আবা বলা হত বিরসা মুণ্ডাকে। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান অনুসারে আব্বা আরবি শব্দ। এখানে আরবির প্রভাব বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে ওষ্ঠজাত ধ্বনি থেকেই সারা পৃথিবীতে বাবা-মা শব্দের বিকল্প শব্দগুলি প্রচলিত হয়েছে। যেমন—পিতর, ফাদার, বাবা, আবা, অব্বা সবই ওষ্ঠজাত ব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত। শিশুরাও তো প্রথম ভাষা শিক্ষার পাঠ নেয় ওষ্ঠ নাচিয়ে। যেমন — বা—বা, মা—মা ইত্যাদি।

বাংলায় বলা হয় 'ওখানে', শব্দটির মূলে রয়েছে 'অণডে'। সাঁওতালিতে যার বিপরীত 'এ্যানডে' মানে এখানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্ববঙ্গীয় উপভাষারূপ 'অডে ক্যানখাড়াইছ, এ্যাডে আইস্য হে'। রাঢ়ি উপভাষায় বাড়ির সামনে চওড়া ফাঁকা বিস্তৃত অংশ উঠোনকে বলা হয় 'উসারা'। এক্ষেত্রে মৌলিক শব্দ হল সাঁওতালি 'ওসার'। এরকম অনেক শব্দের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেগুলিকে সংস্কৃত মূল বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বড় সমস্যা লিখিত প্রমাণের অভাব। গবেষকমহলকে তাই আরও উদ্যোগী হতে হবে।

কোল ভাষায় 'কিষাঁড়' বা 'কিষাণ' শব্দের অর্থ হলো ধনী, অর্থাৎ যিনি চাষ করে বেশি উপার্জন করতে পারেন। এই কৃষক, আর সে যখন অপরের ঘরে কাজ করে তখন 'কিরসেন'। পরবর্তীকালে শব্দের উৎসমূল সংস্কৃত প্রমাণ করতে গিয়ে অনেক আরবি, ফারসি শব্দকে সংস্কৃতজাত বলে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। গবেষক সৈয়দ আব্দুল হালিম এরকম কয়েকটি শব্দের উদাহরণ দিয়েছেন—

ক. 'গরম' এই শব্দটিকে তিনি সংস্কৃত বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন 'ঘর্ম্ম' শব্দটির উল্লেখ করে। অথচ 'ঘর্ম্ম' শব্দে অর্থ ঘাম। তার পরে হালিম সাহেব দেখিয়েছেন, 'গরম' শব্দটি ফারসি। সুতরাং সেমীয়-হামীয় গোষ্ঠীর শব্দের সঙ্গে মিল থাকারই কথা। লোকসমাজে শব্দটি 'গর্মি'।

খ. 'মিনতি' শব্দটি আরবি। 'মিন্নত' শব্দ থেকে উৎপন্ন। তিনি তাকে মূল সংস্কৃত শব্দ 'বিজ্ঞপ্তি থেকে উৎপন্ন বলে জানিয়েছেন।

গ. 'খোসা' শব্দটি ফারসি 'খশোহ' থেকে উৎপন্ন। এদিকে শব্দটিকে সংস্কৃত 'কোশ' শব্দ থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে।

ঘ. ফারসি 'খোরা' (অর্থ, পাথরের তৈরি বড়ো বাটি বা গেলাস। পাথরের এই বড়ো বাটিতে আমের আচার, মাছের টক রান্না ইত্যাদি রাখা হতো।) শব্দটিকে সংস্কৃত 'খোলক' থেকে উৎপন্ন বলে দেখানো হয়েছে।

ঙ. খাঁটি বাংলা 'গুটা' (অর্থ, জড় করা) শব্দটিকে সংস্কৃত 'গোষ্ঠ' থেকে উৎপন্ন বলে বলা হয়েছে। অবশ্য 'গোষ্ঠ' শব্দের অর্থ এখানে করা হয়েছে, সংঘাত, আর তা হল প্রায় বিপরীত অর্থ। কারণ, জড় করার অর্থ, সংহত করা বা জমা করা বা মিলন। আর সংঘাত শব্দের অর্থ, আঘাত বা বিরোধ।

চ. খাঁটি বাংলা 'কথা' শব্দটিকে সংস্কৃত শব্দ বলে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ছ. ফারসি 'দূর' শব্দটিকে বলা হয়েছে সংস্কৃতমূল। পাশাপাশি 'কিরা' (অর্থ শপথ), 'চরখা', 'খুচরা', 'গর্জন', 'মোছা' (অর্থ পরিষ্কার করা) 'সমুদয়', 'স্বাস্থ্য প্রভৃতি অসংখ্য আরবি, ফারসি, তুর্কি ও প্রাকৃত শব্দকে সংস্কৃতজাত শব্দ বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল, ঝাড়খণ্ড, পুরুলিয়া প্রভৃতিতে অস্ট্রিক গোষ্ঠির মানুষের বর্তমান অবস্থান। এরা ভারতবর্ষে অবস্থানের দিক থেকে আদি ভাষা গোষ্ঠী হওয়ায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষীরা এই বোঙাদের ভাষাকেই অনুসরণ করেছিল। ঋকবেদে 'শম্বর' শব্দটি সরাসরি অস্ট্রিক শব্দ বলেই মনে করা হয়। যে সমস্ত অস্ট্রিক শব্দ অবাধে তারা ব্যবহার করেছে তার নমুনা— ১. প্রাণিবাচক শব্দ — কুকুট, ডিম্ব, পতঙ্গ, মাতঙ্গ, গজ, ব্রাতুলি (বাদুড়)। ২. জল অর্থে — দ (দহ)। ৩. বিকৃত-অঙ্গবাচক শব্দ — পঙ্গু, লঙ্গ (খোড়া), বণ্ড (বাঁড়া), লিঙ্গ (পুং লিঙ্গ), খোড় (খোড়া)। ৪. পুষ্পবাচক শব্দ — পুণ্ডরিক। ৫. ব্যক্তিগুণবাচক শব্দ — লম্পট, আঠেপে (অহংকার), লোল (লোলুপ), কুণ্ঠ (কুভজুজ)। ৬. দ্রব্যগুণ বাচক শব্দ — ফর্মু, রক্তিম, গণ (সমূহ)। ৭. ফল-বৃক্ষ-দ্রব্য বাচক শব্দ — কদলী (কলা), নারিকেল, তাম্বুল, অলাবু, নিম্বুক (লেবু), দাড়িম (ডালিম), মরিচ (লঙ্কা), সর্ষপ (সর্ষে), ডাল (শাখা)। ৮. দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত — ঘট, শৃঙ্গার, বাণ, কোকিল (কয়লা অর্থে), লঙল (লাঙল), শৃঙ্গন। ৯. বাদ্য সংক্রান্ত — দুন্দুভি, পটহ। ১০. গ্রহ নক্ষত্র সংক্রান্ত শব্দ — রাকা (পূর্ণচাঁদ), কুঠ(অমাবস্যা অর্থে)। ১১. ক্রিয়াবাচক শব্দ—ললতি (খেলে) ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শব্দভাণ্ডারে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ

বর্তমান ভারতে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে তামিল, তেলেগু, মালয়লম, কানাড়ী, টোডা, কোটা ইত্যাদি ভাষাভাষি মানুষের অবস্থান এই কথা বলে, যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্রাবিড়দের প্রভাব ব্রাহুই, বালুচিস্তান থেকে শুরু করে উত্তরপশ্চিম ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তারলাভ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় এর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

দ্রাবিড় শব্দকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা গ্রহণ করেছিল সম্ভবত অর্বাচীন বৈদিক যুগে। ক্লাসিকেল বা ধ্রুপদী সংস্কৃত যুগের মধ্যবর্তী সব ঋকবেদে যে সমস্ত দ্রাবিড় শব্দ পাওয়া যায় সেগুলি হল — ময়ূর, কটুক, কুণ্ড, খল, দন্ত, পিণ্ড, বল, বিল ইত্যাদি। ২. পরবর্তী সংহীতা-তে পাওয়া যায় — তুল, বিন্দু, মুসল, কঙ্ক, শূর্প ইত্যাদি শব্দ। ৩. ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় — অলস, পণ্ডিত, করে ইত্যাদি। ৪. বিভিন্ন সময়ে আর যে শব্দ দ্রাবিড় শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় এসেছিল সেগুলি হল — অড়নি, কপি, কর্মার কল, কলা, কিতর, কূট, নানা, নীল, পুষ্প, ফল, বীজ, রাত্রি, সায়ম ইত্যাদি। ৫. ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত স্তরে পণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' কিংবা পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' দ্রাবিড় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এঁদেরও জন্মভূমি রাঢ়বঙ্গে।

বর্ণবাচক শব্দ হিসাবে কাল, কজ্জল, প্রাণি সংক্রান্ত শব্দ হিসাবে — মীন, কাক, বক, বিড়াল ইত্যাদি; জল—অর্থে নীর, তোয়ে, অম্বু; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাচক শব্দ — দাঁত, কুন্তল; পুষ্প সংক্রান্ত শব্দ — কোরক, মল্লিকা, মুকুল, কেতক প্রভৃতি; সংস্কৃতি বাচক শব্দ — মালা, হেম, পূজা, মুক্তা, মুকুট ইত্যাদি; ব্যক্তিগুণ বাচক শব্দ — অলস, খল, চতুর, শঠ ইত্যাদি; দ্রব্যগুণ বাচক শব্দ—কটু, কঠিন প্রভৃতি; ফল-বৃক্ষ-দ্রব্য বাচক শব্দ —চন্দন, তাল, হিমতাল, কানন, পাটল, বিল্ল, কচু প্রভৃতি; দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত শব্দ —কাজ, অনল, কুটি, পপেঠা, তালা, পিষ্টক, গণ্ড, গুড় ইত্যাদি। বাদ্য সংক্রান্ত শব্দ — মুরলী, মুড়জ প্রভৃতি। ক্রিয়াবাচক শব্দ— কুট্ট, চুম্ব ইত্যাদি। এইরকম বহু দ্রাবিড় শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়েছিল, যা বাংলা ভাষার ঐতিহ্য স্বরূপ।

বহুল প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার অর্বাচীন স্তরে সংস্কৃত ভাষা থেকে সরলীকরণ তথা বিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার জন্ম। বর্তমানে এই মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আর্যরা বহিরাগত। আর্য-অনার্যের মিশ্রণের ফলে ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লোকেরা দৈনন্দিন জীবনযাপন-এ যেসব আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করত তার মিশ্রিত বা মৌখিক ভাষাই হল পালি-প্রাকৃত ভাষা; আর তাই বাংলা ভাষার মূল। এখান থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম। লেখ্য বাংলায় সংস্কৃত ভাষার কমবেশি ভূমিকা থাকলেও বাংলা ভাষার নিজস্ব ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহ্য ছাড়া সভ্যতার বিকাশ ও জ্ঞানচর্চার বিকাশ সম্ভব নয়। T.S. Eliot তাঁর ''Tradition and Individual Tallent' (১৯১৯) প্রবন্ধে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এইসব সূত্রকে অনুসরণ করে বলা যেতেই পারে, যে প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন চর্যাপদের

আগেও বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ছিল। শহীদুল্লাহের চর্যা গবেষণায় পদকর্তাদের যে সময়কাল অর্থাৎ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ নির্দেশিত হয়েছে তাকে আজও সেভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি। চর্যাগীতির সময়কাল নিয়ে নানা বিতর্কের পর সর্বনিম্ন সময়কাল যদি সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ধরা হয় তাহলে তারও আগে এমন অনেক বাঙালির রচিত সাহিত্য পাই যার মধ্যে বাংলা শব্দের ব্যবহার ঘটেছে। চর্যাগীতি রচনা শুরু হওয়ার পরেও সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ অবহটঠ-এর বিভিন্ন প্রকীর্ণ শ্লোক-এ বাংলা ভাষার বিক্ষিপ্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে। তার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে —

সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলায়ুধ মিশ্রের শেক শুভোদয়া-র কিছু পংক্তি— 'বিনা বায়ুতে ভাঙ্গে তালের গাছ', 'বনের শাক খায় শেক বনের গোন' /'ছিকরির পোটলি বান্ধিয়া দেয়/ হাটে বিকাইলে হয় সোনা।' নাড়পাদ রচিত সংস্কৃত 'সেকোদ্দেশটীকা' টীকা গ্রন্থে উদ্ধৃত বাংলা কবিতা ছত্র—'বাম দাহিনে সুম ঘাট/ভনই কাহ্ন অন্তরালে বাট চতুরাভরণ' ভুসুকু রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অপভ্রংশ মিশ্রিত দু-একটি ছড়া—'রবিকলা মেলহ, শশিকলা বরাহ, বেনি বাট বহন্ত।/তোড়হ সমন্তা সমরস জাউ ন জায়তে কাগন জাগফলা খায়।'

মানসোল্লাস ও সংস্কৃত বিশ্বকোষ গ্রন্থ যেখানে কয়েকটি বাংলা শ্লোক আছে। যেমন — 'জে ব্রাত্মণের কুলে উপজিয়া কার্তবীর্যা জিনে বাঠফরসে খণ্ডিয়া পরশ রামু দেবু সে মোহার মঙ্গল করউ।' দেশীনামমালা ও আচার্য হেমচন্দ্র কৃত শব্দতালিকা। যেমন — অল্লউ পলট্ট (উল্টোপাল্টা), ওসরিও (উসরো/বারান্দা), কাট্টারী (কাটারি), চাউল (চাল), টুংটো (ঠুটো), ডুম্ব (জোম), তল্ল (তাগা), বপ্প (বাপ), ছিনাল (ছিনার) ইত্যাদি। টীকাসর্বস্ব ও সর্বানন্দ রচিত এই টীকা গ্রন্থে ব্যবহৃত দেশি শব্দাবলী। যেমন — অম্বাড় (আমড়া), কালজা (কলজে বা মেটে), খিড়কি (খিড়কি), চাতিপন্ন (ছাতিম), জুমাল (জোয়াল), পগার (পগার), ফড়িঙ্গ (ফড়িং), বাদিয়া (বেদে), বেট (বেগার) ইত্যাদি। চৈনিক অভিধান ও সংস্কৃতে রচিত চৈনিক অভিধানে সংকলিত কয়েকটি বাংলা শব্দ। যেমন — আইশ (এসো), আট (আটা), ভাতার (ভাতার), হট (হাট), মোট্টু (মোটা)। লোকসাহিত্য ও লোক মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত বিভিন্ন ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, হেঁয়ালি, ডাক ও খনার বচন ইত্যাদি। তাম্রশাসন লিপিঃ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও এইসব লিপিতে বাংলা শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন আঢ়া (ধানের মাপ), খিল (পতিত জমি), জোল (জোল, লম্বাকৃতি জলাভূমি), নল (নালা) ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত

বাংলা শব্দভাণ্ডারে দেশি তথা অনার্য বিশেষ করে অস্ট্রিক শব্দের প্রচুর ব্যবহার আছে। ড. ক্ষুদিরাম দাশ বলেছেন—'বাংলায় ওদের কাছ থেকে ঋণের পরিমাণ দশ-বারো হাজার (শব্দ) নিশ্চয়।' এই শব্দগুলিই হল বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ। শহীদুল্লাহ বলেছেন—'বাঙ্গালার অস্ট্রিক ভাষীরা বাঙ্গালা ভাষায় কেবল তাদের বাক্‌ভঙ্গীর ছাপই রাখিয়া যায় নাই, ইহার

শব্দকোষেও প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বহু শব্দ যোগ করিয়াছে।' বাংলার ঐতিহ্য অনুসারী এই ধরনের শব্দগুলি হল ঝাঁটা, ঝুড়ি, ডাঙ্গা, ঝিঙে ঢোল, অঢেল, কুদ ইত্যাদি। এছাড়া প্রচুর ধন্যাত্মক শব্দ হিসাবে বরবর, চকচক, ঝলমল, সরসর, বকবক, মচমচ, শিরশির, পটপট ইত্যাদি।

গুপ্ত যুগে এই ভাষা অস্পৃশ্যতার ফাঁদে পড়ে। অথচ আমরা ভুলে যাই, চর্যাপদের যুগে এলেও তার আগে থেকেই বাংলাভাষায় সাধারণ মানুষের বাগবিনিময় চলতো। একদিনে দুম করে ভাষা তৈরি হয়ে তো আর চর্যা গান লেখা হয়নি। একদা 'বোঙা' জাত বাঙালির মানুষের মুখের ভাষাকে 'পাখির কিচির মিচির' বলে নিন্দা করা হতো। আর এখন আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতির সম্মেলনে গিয়ে পাটনার রাস্তায় বাংলা বলার জন্য গালি খেতে হয়।

ব্যাকরণের নিয়মে বেঁধে সংস্কৃত ভাষার সংস্কার করলেন পাণিনি, তাই ভাষা হল সংস্কৃত। বলা হল সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃতের জন্ম, কিন্তু আদতে তা নয়। প্রাকৃত ভাষা অর্থাৎ প্রজা সাধারণ বা নিচু বা ইতর শ্রেণির ভাষা অর্থাৎ বেদীয় বা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ভাষা নয়। এই সহজ প্রাকৃতরূপ পালিতেই গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধম্ম প্রচার করলেন। তারপর বলা হল 'অপভাষা। সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে 'অপ' শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখতে গিয়ে বলা হয়েছে 'অব্যঃ কুৎসিত প্রতিকূল' ইত্যাদি সূচক উপসর্গবিশেষ। অপ দিয়ে শব্দগুলো লক্ষ করার— অপকর্ম, অপকীর্তি, অপমান ইত্যাদি। তেমনি করেই বাংলা ভাষাকে বলা হলো — অপভ্রংশ, অবহট্ঠ, অপভ্রষ্ট।

দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে একসময় পণ্ডিতদের ঘোষণার কথা লিখলেন 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ/ ভাষায়াং মানবং ত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।' অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ ও রামচরিত যারা দেশীয় ভাষার মানব শ্রবণের যোগ্য করে অর্থাৎ অনুবাদ করে, তারা যায় রৌরব নরকে। কে জানে কৃত্তিবাস ওঝা, মালাধর বসু, কাশীরাম দাস প্রমুখরা নরকে আছেন কিনা? তুর্কি আক্রমণের পর মুসলমান শাসকদের সহায়তায় বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ঘটলো। আর কেনই বা তারা বাংলাভাষা চর্চায় পোষণা দান করবেন না। সতেরো-আঠারো জন অশ্বারোহী তো আর পিঠে করে কয়েকটা মেয়ে বেঁধে আনেননি। বিজয়ের পর বাঙালি নারীকেই তারা জীবনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করলেন। সেই নারীদের মুখের ভাষা বাংলা। বৌয়ের মুখের ভাষা পোষণা প্রাপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। এখানে দুর্ধর্ষ তুর্কি শাসকরাও বৌ-ভীতু বাঙালি হয়ে গেলেন। মূলত রাজসভার পোষণাতেই মধ্যযুগে রচিত হল একের পর এক বাংলা সাহিত্য। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে শুরু করল। আর অন্যদিকে শাস্ত্রানুবাদকারী সংস্কৃত পণ্ডিতগণ কবিদের গালি দিয়ে বলেছিলেন — 'কৃত্তিবেসে কাশীদেশে আর বামুন ঘেঁষে, এই তিন সর্বনেশে।' কিন্তু লোক নিস্তারিতে তাঁদের অনুসৃত রচনাই বাঙালির প্রাণের সম্পদ হয়ে উঠলো। এই ভাষা মুখে নিয়ে জন্ম নিলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল।

ইতিহাস

সুমিতা দাস

শিল্প বিপ্লবে ভারতের বস্ত্রশিল্পের ভূমিকা

শিরোনামটা দেখে মনে হতে পারে, ব্যাপারটা কী! শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের মিলের কাপড় আমাদের বস্ত্রশিল্পের ক্ষতি করেছে, 'তাঁতিদের হাড়ে বাংলার মাটি সাদা হয়ে গেছে'- এসব তো আমরা জানি। কিন্তু উল্টোটা? ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবে ভারতের বস্ত্রশিল্পের অবদান? ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না!

আজকের নিবন্ধে এটা নিয়েই বলব। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবে ভারতের বস্ত্রশিল্পের অবদান।

বলার আগে দুটো প্রশ্ন রাখি পাঠকের সামনে- ভাববার জন্য।

আচ্ছা, ইংল্যান্ডে বা পুরো ইউরোপেই তো তুলো চাষ হয় না। বস্তুত, শিল্প বিপ্লবের কয়েক দশক আগেও ইংল্যান্ডে কেউ শুধু তুলো থেকে সুতিবস্ত্র তৈরি করতে পারত না। তাহলে কেন ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবে প্রথমেই আসে সুতিবস্ত্র-শিল্প? শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রথম যেসব উদ্ভাবনগুলির কথা জানি, যেমন স্পিনিং মেরি (১৭৬৪), ওয়াটার ফ্রেম (১৭৬৫), স্পিনিং মিউল (১৭৭৯) সবগুলি সুতিবস্ত্র-শিল্পের সঙ্গে জড়িত, তুলো থেকে সুতা কাটার যন্ত্র?

আর একটা প্রশ্ন। কলকাতায় ইংরেজরা ঘাঁটি গাড়ে তিনশো বছরের বেশি আগে, সেই ১৬৯০ সালে। জব চার্ণক ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তখন এই অঞ্চলে আরও অনেক ইউরোপীয় শক্তি আগে থেকেই ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। পর্তুগিজরা এসেছে সবার আগে। ১৫৭৯ সালে তারা আকবর বাদশার অনুমতি নিয়ে হুগলিতে ঘাঁটি গেড়েছিল। তারপর এসেছে ওলন্ডাজ বা ডাচরা। ১৬৫৬ সালে তারা চুঁচুড়ায় 'ফ্যাক্টরি' (বাণিজ্যকেন্দ্র) তৈরি করে। ১৭৫৫ সালে ডেন (ডেনমার্কের বাসিন্দা) এসে শ্রীরামপুরে 'ফ্রেডেরিকনগর' স্থাপন করে। সপ্তদশ শতকের শেষাশেষি আবার ফরাসিরা এসে তৈরি করল চন্দননগর; রীতিমতো একটা নগর।

এখন প্রশ্ন হলো, ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টদশ শতকে কেন এতগুলি ইউরোপীয় শক্তি এসে হুগলি নদীর তীরে পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে ঘাঁটি গেড়েছিল, যেখানে আজ বিশ্বায়নের যুগেও কলকাতা থেকে সরাসরি ইউরোপ যাওয়ার কোনও উড়ান নেই!

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে শুরু করি। মনে রাখতে হবে, সে সময়ে মাল পরিবহনের মূল পথ হলো জলপথ। নদী হয়ে সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলে। সেই ১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামা মশলার সন্ধানে প্রথম যখন ভারতের মাটিতে (কালিকট) পা রাখেন, তারপর থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলি নানা পণ্যের সন্ধানে ভারত ও এশিয়ার নানা দেশে হানা দেয়। 'হানা দেয়' বলছি, কারণ তাদের সব বাণিজ্যতরীই ছিল রণতরী। কামানের গর্জনে প্রতিযোগীদের হঠিয়ে, পণ্য প্রস্তুতকারীদের ওপর জোর খাটিয়ে 'ব্যবসা' করে আসছে তারা, ভাস্কো দা গামার ভারত আগমনের প্রায় প্রথম দিন থেকেই। সে এক বিশাল ইতিহাস। কিন্তু কী ছিল সে সব পণ্য, যার জন্য ভারত বা সম্পূর্ণ এশিয়া ইউরোপীয়দের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল?

পর্তুগিজরা ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এসেছিল মশলার খোঁজে। তখনকার ইউরোপে মশলার চাহিদা বেশ ভালো—গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, জয়িত্রী প্রভৃতি। আর এসব মশলা পাওয়া যায় শুধু ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে। সেখান থেকে ইউরোপে মশলা যেত আরব বণিকদের হাত ঘুরে। তাতে মশলার দাম বড্ড বেশি পড়ে। তখনকার ইউরোপে সমুদ্র অভিযানে সব চেয়ে এগিয়ে থাকা শক্তি পর্তুগিজরা চেষ্টা করতে লাগল আরবদের এড়িয়ে ভারতে আসার। ব্যাপার খুব সহজ ছিল না। আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চলের মানচিত্র তাদের জানা ছিল না। যাই হোক, অনেক চেষ্টার পর, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে সে মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে সেখান থেকে আবার উত্তর মুখী হয়ে আরব সাগর দিয়ে ভারতে এসে পৌছয় পর্তুগিজরা। তার পর তারা ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া থেকে মশলা কিনে ইউরোপে মশলা বাণিজ্যে প্রচুর লাভ করতে থাকে।

পর্তুগিজদের পর আসে ডাচরা। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারাও প্রথমে শুধু মশলার বাণিজ্যেই মন দেয়। কিন্তু কিছু পরেই তারা বুঝতে পারে, ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলোতে ভারতীয় সুতিবস্ত্রের খুব চাহিদা। তাহলে ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার পথে ভারত থেকে কাপড় নিয়ে গিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় সেই কাপড় বিক্রি করে মশলা কিনলে তো ডবল লাভ!

সেই থেকে শুরু। পরে দেখা গেল, শুধু ইন্দোনেশিয়া কেন, পূর্ব আফ্রিকায়ও বহুদিন ধরে ভারতীয় বস্ত্রের একটা বাজার আছে। এশিয়া থেকে ফেরার সময় সেখানে ভারতীয় সুতিবস্ত্র বিক্রি করে হাতির দাঁত আর সোনা নিয়ে ফেরা যায়। ইউরোপীয়দের সমুদ্র বাণিজ্যে ভারতীয় বস্ত্রের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

এর মধ্যে স্পেনীয়রা আমেরিকা 'আবিষ্কার' করেছে। তারা সেখানকার মূল বাসিন্দাদের হঠিয়ে জমি দখল করে তামাক, আখ ইত্যাদির চাষ শুরু করেছে। তার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম জোগানোর জন্য আফ্রিকা থেকে কিনে আনা হচ্ছে মানুষ, আর এইসব ক্রীতদাসদের শ্রমে গড়ে উঠছে 'আমেরিকা'। আমেরিকায় তখন ক্রীতদাসদের দারুণ চাহিদা। ক্রীতদাস কিনে আনার বাণিজ্যে দারুণ লাভ। ক্রীতদাস কিনে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম আফ্রিকার বেনিন, ঘানা অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলের বাজার থেকে। এই বাণিজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বড়ো

বড়ো ইউরোপীয় শক্তিগুলির সবাই। এই অবস্থায় পশ্চিম আফ্রিকার 'দাস উপকূলে'ও অচিরেই ভারতীয় বস্ত্র খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ভারতীয় বস্ত্রের বিনিময়ে আফ্রিকার দাস কেনা ও চালান দেওয়ার ব্যবসা জমে উঠল। অতলান্তিকের পারে জমে উঠল ভারতীয় সুতিবস্ত্রের বাজার।

এর পর আমেরিকা। দাসদের পরার জন্য মোটা কাপড় থেকে প্ল্যান্টেশন মালিক, দাস ব্যবসায়ী বা খনিমালিকদের জন্য ইউরোপের হালফ্যাশন অনুসারে পোশাক-ভারতীয় বস্ত্র বাণিজ্য এখানেও ফুলে ফেঁপে উঠল।

ইউরোপীয়দের এই এত বাণিজ্য, এত লাভ, সব কিছুর পেছনে ভারতীয় সুতিবস্ত্র। ভারতের চাষির তৈরি তুলো, ভারতের মেয়েদের হাতে চরখায় কাটা সুতো, ভারতের তাঁতির বোনা কাপড়, রংকরের হাতে ভেষজ রঙ দিয়ে ছাপা ও ভারতীয় ধোপার হাতে ধোপধুরস্ত হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। খেয়াল করতে হবে, সব কাপড় এক

তুলো থেকে সুতো তৈরির কাজটা ছিল মেয়েদের হাতে। নানা অঞ্চলের নানা চাষি বুনত নানা রকমের কাপড়। সেই নানা ডিজাইনের, নানা মাপের, নানা মানের। সেসব কাপড় রঙ করা, ছাপা বা চিত্রিত করার কাজ করত নানা এলাকার নানা ধরনের মানুষ। এদের মধ্যে ছিল নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, ছিল নানা জাতির মানুষ।

ধরনের নয়। ইন্দোনেশিয়ার মানুষ চান রামায়ণ মহাভারতের দৃশ্য আঁকা বড়ো চাদর, তো ঘানার মানুষ পছন্দ করেন নানা রঙের ডোরা দেওয়া একটু খাটো কাপড়। ইউরোপের অভিজাতদের পছন্দ মসলিন বা সূক্ষ্ম কাজ করা উচ্চদরের মিহি কাপড়, তো ইউরোপের সাধারণ মানুষ কিনতে চান অভিজাতদের পোশাকের মতো সুন্দর ছাপা কিন্তু তুলনায় কম দামের সুতি-বস্ত্র।

ভারতের নানা জায়গায় তখন নানা রকমের তুলো চাষ করত চাষিরা। যেমন পদ্মা-মেঘনার চরে তৈরি সূক্ষ্ম তুলো ছাড়া মসলিন তৈরি করা যেত না। তুলো থেকে সুতো তৈরির কাজটা ছিল মেয়েদের হাতে। নানা অঞ্চলের নানা চাষি বুনত নানা রকমের কাপড়। সেই নানা ডিজাইনের, নানা মাপের, নানা মানের। সেসব কাপড় রঙ করা, ছাপা বা চিত্রিত করার কাজ করত নানা এলাকার নানা ধরনের মানুষ। এদের মধ্যে ছিল নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, ছিল নানা জাতির মানুষ।

ভারতের এই সুতিবস্ত্রের বিশ্বজোড়া চাহিদার কারণ কী ছিল? এর উত্তরে প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, প্রাচীন গ্রিস বা রোমান্দের লেখাতেও ভারতের অত্যাশ্চর্য্য মসলিনের

এবার একটু ইউরোপের দিকে তাকানো যাক। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ইউরোপ সমুদ্র-বাণিজ্যে, নৌ-শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠছে। সারা বিশ্বের সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করছে। কিন্তু তাদের নিজেদের রপ্তানি করার মতো পণ্য বিশেষ নেই। উল ও উলবস্ত্র তারা রপ্তানি করতে পারে, কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকার গরমের দেশে উলের চাহিদা নেই। বাকি থাকে লোহা আর কিছু যন্ত্রপাতি। তার বাজারও সীমিত।

উল্লেখ পাওয়া যায়। মিশরে মাটি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা পেয়েছেন আনুমানিক ১৪০০ সালের অনেক ভারতীয় বস্ত্রখণ্ড, ছশো বছর পরেও সেগুলির রঙ ও ডিজাইনের সূক্ষ্মতা আমাদের মুগ্ধ করে। মনে রাখতে হবে, সে সময়ে রাসায়নিক রঙ আসেনি, রঙ পাকা করার রাসায়নিক উপায় তখন দূর ভবিষ্যতের গর্ভে, এমনকি কাপড়কে সাদা করার জন্য ব্লিচ বলেও কিছু পাওয়া যেত না। শ্রম, পুরুষানুক্রমে অর্জিত জ্ঞান আর প্রাকৃতিক দ্রব্যাদি দিয়েই এসব কাজ করতে হতো। তা সত্ত্বেও সে সময়ে ভারতীয়দের তৈরি কাপড় ছিল সস্তা, মিহি, টেকসই। কাপড়ের রঙ ও ছাপা ছিল উজ্জ্বল। বার বার ধুলেও রঙ উঠত না। ডিজাইনের বৈচিত্র্য ছিল মনোমুগ্ধকর। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টদশ শতকে ভারতীয় বস্ত্রের বিশ্ব জোড়া চাহিদার মূল চাবিকাঠি ছিল এগুলি। ভালো কাপড়, ভালো রঙ, ভালো ডিজাইন; এবং ক্রেতার চাহিদা অনুসারে এগুলি পরিবর্তনের ক্ষমতা।

এবার একটু ইউরোপের দিকে তাকানো যাক। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ইউরোপ সমুদ্র-বাণিজ্যে, নৌ-শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠছে। সারা বিশ্বের সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করছে। কিন্তু তাদের নিজেদের রপ্তানি করার মতো পণ্য বিশেষ নেই। উল ও উলবস্ত্র তারা রপ্তানি করতে পারে, কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকার গরমের দেশে উলের চাহিদা নেই। বাকি থাকে লোহা আর কিছু যন্ত্রপাতি। তার বাজারও সীমিত।

অন্যদিকে ইউরোপের বস্ত্র বাজারে ভারতীয় বস্ত্র এসে সে দেশের উল ও লিনেন (একরকম গাছের তন্তু দিয়ে তৈরি মোটা কাপড়) শিল্পের বাজারে ভাগ বসাচ্ছে। শুরু হয়েছে 'ক্যালিকো ক্রেজ'। সবাই ভারতেয় বস্ত্র চায়। উল ও লিনেন ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছে ধরনা দিলেন। ইংল্যান্ডে ভারতীয় বস্ত্র ঢোকা বন্ধ করতে হবে।

এই দাবির মুখে প্রথমে ইংল্যান্ডের সরকার ভারতীয় বস্ত্র আমদানির ওপর কর বাড়াতে থাকে। যে শুল্ক ছিল ৭.৫ শতাংশ, সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে তা দু-দুবার ১০ শতাংশ করে বাড়ানো হয়। তাতেও ভারতীয় বস্ত্র আমদানি কমল না। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ভারতীয় বস্ত্র আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো।

প্রথমে এই নিষেধাজ্ঞা ছিল শুধু ছাপা কাপড়ের ওপর। সাদা সুতিবস্ত্র এনে ইংল্যান্ডে ছেপে বিক্রি করা যাবে। আর ধনীদের বিলাস দ্রব্য অতি সূক্ষ্ম চিন্‌জ বা মসলিন আমদানিও নিষিদ্ধ করা হয়নি। তখন ইংল্যান্ডে কাপড় ছাপার ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। ভারতের মতো অত সূক্ষ্ম ডিজাইন বা অনেক রঙ একসাথে ছাপতে না পারলেও ইংল্যান্ডে তখন এক রঙে ছাপার কাজটা কিছুটা এগিয়েছে। সুতরাং ভারত থেকে সুতিবস্ত্র আমদানি করে ইংল্যান্ডে ছেপে বিক্রি ও রপ্তানি করার প্রচেষ্টা চলতে লাগল।

কিন্তু তাতেও সমস্যা মিটল না। লিনেন ও উল উৎপাদকরা আভিযোগ করলেন, আগে তবু ভারতীয় ক্যালিকো (খুব সম্ভব কালিকট থেকে আসা, এই অর্থে শব্দটা প্রথম ব্যবহার হয়, পরে সাধারণভাবে ভারতীয় সুতিবস্ত্র বোঝাতে ক্যালিকো শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে) শুধুমাত্র ধনী আর অভিজাতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন ইংল্যান্ডে ছাপা ভারতীয় সুতিবস্ত্র ঢুকে পড়ছে সাধারণ মানুষের ঘরেও।

১৭১৯ সালে লন্ডনের রাস্তায় মহা গন্ডগোল বেধে গেল। উল ও সিল্ক উৎপাদকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে রাস্তায় নামল, তারা মহিলাদের গা থেকে ক্যালিকো ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। ১৭২১ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সব ধরনের ভারতীয় সুতিবস্ত্র নিষিদ্ধ করল। অবশ্য অন্য দেশে রপ্তানির জন্য ভারতীয় বস্ত্র আমদানি নিষিদ্ধ হয়নি।

ইংল্যান্ডের বস্ত্র উৎপাদকরা এবার ভারতের কাপড়ের মতো কাপড় উৎপাদনে উঠেপড়ে লাগল। মুস্কিল হলো, ইংল্যান্ডের মেয়েরা এতদিন চরকা দিয়ে লিনেনের মোটা তন্তু থেকে সুতো কেটে এসেছে, তারা তুলোর সূক্ষ তন্তু থেকে ভালো সুতো কাটতে সক্ষম হলো না। সুতো হয় বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে, আবার সরু সুতো কাটতে গেলে সে সুতোয় জোর থাকছে না, সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে।

এখন আমরা যদি তাঁতে কাপড় বোনার কথা ভাবি, সেখানে প্রথমে 'টানার সুতো' লম্বালম্বি ভাবে টাঙানো হয়, তার পর 'পোড়েনের সুতো' আড়াআড়িভাবে তাঁতে বোনা হয়। টানার সুতোটা খুব পোক্ত হতে হয়, নইলে ছিঁড়ে যাবে। টানার সুতো হিসেবে লিনেনের সুতো ব্যবহার করে

১৭১৯ সালে লন্ডনের রাস্তায় মহা গন্ডগোল বেধে গেল। উল ও সিল্ক উৎপাদকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে রাস্তায় নামল, তারা মহিলাদের গা থেকে ক্যালিকো ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। ১৭২১ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সব ধরনের ভারতীয় সুতিবস্ত্র নিষিদ্ধ করল। অবশ্য অন্য দেশে রপ্তানির জন্য ভারতীয় বস্ত্র আমদানি নিষিদ্ধ হয়নি।

আর পোড়েনের সুতো হিসেবে তুলোর সুতো ব্যবহার করে ইংল্যান্ডের তাতীরা কাপড় বুনতে লাগল, তার নাম 'ফাসচান'। কিন্তু সম্পূর্ণ তুলো-জাত সুতির কাপড়, সুতির সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনতে তারা অসমর্থ।

সমস্যাটা সুতো কাটার ক্ষেত্রে। সমাধানও এলো সেই পথেই। প্রযুক্তিগত সমাধান। ১৭৬৫ সালে জেমস হারগ্রিভস আবিষ্কার করলেন স্পিনিং জেনি নামের এক যন্ত্র। তাঁতে একই সময়ে অনেকগুলো টাকুতে অনেক বেশি পরিমাণ সুতো কাটা যায়। এরপর ১৭৭১ সালে এলো ওয়াটার ফ্রেম। সুতো কাটার এই যন্ত্রটি চলবে জলশক্তিতে। এই যন্ত্রে শক্ত সুতো তৈরি করা গেল, যা 'টানার সুতো'-র কাজ করতে পারবে। এর আট বছর পরে, ১৭৭৯ সালে উদ্ভাবিত হলো আর একটি যন্ত্র, স্পিনিং মিউল। জলশক্তি ব্যবহার করে এই যন্ত্রে একই সাথে মিহি ও শক্ত সুতো কাটা যাবে, সময়ও লাগবে অনেক কম।

সুতো কাটার সমস্যা সমাধানে ইংল্যান্ডের এই যন্ত্রনির্ভর পথ শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি তৈরি করে। যন্ত্র কিনতে পুঁজি লাগে, তার অবস্থানও যত্রতত্র হতে পারে না, তা হতে হবে নদী বা খালের মতো জলধারার কাছে। ফলে তৈরি হলো কারখানা। তুলো থেকে সুতো কাটার কারখানা। সুতো সস্তা হয়, হয় পোক্ত। সম্পূর্ণ তুলোজাত সুতিবস্ত্র তৈরি করতে সফল হয় ইংল্যান্ড। উৎপাদনে আসে গতি। উৎপাদিত পণ্য হয় সস্তা। আসে শিল্প বিপ্লব। কয়েক দশকের মধ্যে এই বিপ্লব আরও গতি পাবে বাস্পীয় ইঞ্জিনের হাতে।

শিল্প বিপ্লবের ফলে কারখানার সস্তা সুতোয় তৈরি সস্তা কাপড় এবার রপ্তানি করতে শুরু করবে ইংল্যান্ড। খেয়াল করার, তত দিনে পলাশির যুদ্ধ হয়ে গেছে। বণিকের মানদণ্ড বাংলায় রাজদণ্ড হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এবার বণিক ইংরেজরা বিশ্বের নানা বাজারে ভারতীয় সুতিবস্ত্রের জায়গায় নিজের দেশে তৈরি সস্তার সুতিবস্ত্র রপ্তানি করতে শুরু করল। ক্রেতারা প্রথমে একটু গাঁইগুই করেছিল। বড্ড মোটা কাপড়। রঙ তেমন ভালো নয়, ধুলেই উঠে যায়। কিন্তু ততদিনে ব্রিটিশ বণিকরা সমুদ্র বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিকার অর্জন করেছে। তারা যা আনবে তাই নিতে হবে। তাছাড়া এ কাপড় দামেও সস্তা। শিল্প বিপ্লবের রথ এগিয়ে চললো। এগিয়ে চলল ইংল্যান্ড তথা ইউরোপ। পিছিয়ে পড়তে লাগল ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য। কাজ হারাতে লাগল ভারতের তুলোচাষি, সুতো কাটিয়ে থেকে, তাঁতি, রঙকর, ধোপা, বণিক। ভারত গরিব হয়ে উঠতে লাগল।

সময়টা অষ্টদশ শতকের শেষাশেষি। তার পর গঙ্গ-পদ্মা দিয়ে আরও কত জল গড়িয়ে গেছে। আমরা ভুলেই গেছি যে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব এসেছে ভারতের বস্ত্রশিল্পকে নকল করে। ভুলে গেছি যে 'মুক্ত বাণিজ্য' নয়, ভারতের বস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্প বিশ্বসেরা হয়েছে। এদিকে আমরা আজ যখন ইউরোপীয় সাহেবদের কাছ থেকে 'মুক্ত বাণিজ্যের' নির্দেশ পাই, তখন দ্বিরুক্তি না করে নিজেদের দেশের উৎপাদকদের সর্বনাশ করে সেই নির্দেশ পালন করি।

ইতিহাস ভুললে কিন্তু বিপদ আছে!

দৃষ্টিপাত

বন্দে আলী

মুসলমানদের স্বাধিকার : পক্ষ প্রতিপক্ষ

হ্যাঁ বিগত কয়েক বছরে মুসলিম সমাজে জলসা বেড়েছে, নবী দিবস বেড়েছে, নবী দিবসের মিছিল বেড়েছে, তবলীগ জামাতের কাজ বেড়েছে, সালাফী মতাদর্শ কিছুটা নতুন ভাবে এসেছে; শিক্ষিত মুসলিমরা টুপি পরছেন, নামাজ-রোজা-পর্দা করছেন; তবে এসব দেখে সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ঘরানা বা কোনো স্কুল অফ থট দৃঢ় ভিত্তি পাচ্ছে। এইসব যা কিছু হচ্ছে তাকে সামগ্রিকভাবে ধর্মপরায়নতা প্রসারের অতিরিক্ত কিছু বলে মনে করা বাঞ্ছনীয় নয়।

মুসলমান সমাজে লিবারেল সেক্যুলার ঘরানার মন ও মননে সালাফী ওয়াহাবী মানেই উগ্র বা কট্টর এই ধারনা যে জেকে বসেছে তার সাপেক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রোপচার হওয়া দরকার। মুসলমান আইডেন্টিটি ও প্র্যাকটিস সম্বন্ধে লিবারেল সেক্যুলর ঘরানার মানুষদের চিন্তার কিছু সীমাবদ্ধতা এখন সুস্পষ্ট। এক পক্ষের ধার্মিকতাকে দায়ী করা হয় অন্যপক্ষের বিদ্বেষী হয়ে ওঠার কারণ হিসেবে। সংখ্যালঘুর কতিপয় ধর্মীয় আচার আচরণ, পোশাক, খাদ্যাভাস এমনকি জায়গার নাম কি করে ক্ষমতা কাঠামোর ৯৫ শতাংশ ভোগীদের ভীত করে, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা ও বিদ্বেষী করে তোলে, সে বিশ্লেষণ চাপা পড়ে যায় এই ভাবনার নিচেয়।

হিন্দু সমাজের একটা অংশ মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ। তাদের সংখ্যা যাই হোক তাদের সমর্থক অনেক। মুসলিমরা কত খারাপ বা হিংস্র তা প্রমাণ করার জন্য উপন্যাস নাটক কবিতা প্রভৃতির সূত্রপাত হয়েছে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে। এখন মুভিও বানানো হচ্ছে। হাজার হাজার সোশ্যাল মিডিয়ার পেজ গ্রুপ পোর্টাল থেকে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলিমরা খালি ডিফেন্ড করছে। এটা ঠিক নয়। এখন মুসলিমদের দিক থেকে হিন্দু সমাজের মন ও মননের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে হবে। আর সেটা করতে হবে কোনোরকম ফেক বা মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে; সত্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণভাবে। না হলে অন্যপক্ষের মনে ভুয়ো নৈতিক উচ্চম্মন্যতা প্রশ্রয় পাবে, যা সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই হানিকর। বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন হয়েছে বা হচ্ছে, এটা যদি সত্য হয় তবে এও সত্য যে, এদেশ থেকে অসংখ্য মুসলিম বিতাড়িত হয়েছে; কলকাতার মুসলিমদের সংখ্যা কমেছে সাংঘাতিকভাবে, মসজিদ-মাদ্রাসা দখল

করে নেওয়া হয়েছে; এসব ভাষ্যও প্রণয়ন করতে হবে। জুলুমের বিরুদ্ধে লড়তে হলে স্বপক্ষীয় অস্ত্রে শাণ দিতে হবে বিশেষ করে। তা না করে যদি প্রতিপক্ষের পাতা ফাঁদে পা দেওয়া তবে সর্বনাশের চূড়ান্ত হবে। আর তথাকথিত সেক্যুলর মুসলমান সমাজ এই সর্বনাশটাই সাধন করছেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে মুসলিমরা নিজেদের রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে আপোষ করে যে সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের চেষ্টা করে এসেছে সেটা নিয়ে পুনরায় ভাবতে হবে। এখন মুসলমানদের নায্য অধিকার দাবি করতে গেলেও দশবার ভাবতে হচ্ছে। পাছে সাম্প্রদায়িকতার তকমা গায়ে লেগে যায়। এত করেও কিন্তু শেষরক্ষা হচ্ছে না। প্রতিবেশী সমাজ তাদের কাজ করেই চলেছে। তারা কারণে অকারণে যার তার উপর লেপ্টে দিচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার লেবেল। তাদের এই কৌশলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে মুসলমান সমাজের অবস্থা এখন এতটাই শোচনীয় যে, নিজেদের সাংবিধানিক অধিকারের সঙ্গে সমঝোতা করতে করতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হওয়ার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তারা।

নিজেদের রাজনৈতিক অধিকারের কথা বললে সমাজে রাজনৈতিক মেরুকরণ আরও মারাত্মক মাত্রা পাবে, এমনটা ভেবে মুসলমান সমাজ এই যে বরবারই নিজেদেরকে পিছনের সারিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে এর ফল মারাত্মক হতে বাধ্য। একপক্ষের সীমাহীন আত্মত্যাগের পথে সম্পর্কের স্বাভাবিকতা কখনো স্থায়ী হতে পারে না। দ্বান্দ্বিকতার ঘাত প্রতিঘাতে সংঘটিত সমাঝোতা এবং সমন্বয় ঐতিহাসিক সত্য। এর বিপরীতে কিছু করতে চাওয়া মানে ইতিহাসকে অস্বীকার করা।

পাছে সংখ্যাগুরুরা চটে যায়, অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী দলের দিকে আরও বেশি করে ঝুঁকে পড়ে তার জন্য মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার সমানুপাতিক অংশদারিত্ব দাবি করছে না। বিধানসভা বা লোকসভায় সংখ্যানুসারে প্রতিনিধিত্ব চাইছে না। নীরবে মেনে নিচ্ছে মুসলমান প্রধান বিধানসভা বা লোকসভা কেন্দ্রে এস সি সংরক্ষণ। হিন্দু নেতৃত্বের সঙ্গে আপোষ করে নিজেরে সেক্যুলর ভাবমূর্তি বজায় রাখতে চাইছে। বলা যায়, এখন অধীনতামূলক মিত্রতানীতির নতুন ভাষ্য ফলিত রূপ পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক জীবনে।

মুসলিমরা যদি ভাবে, এভাবেই তারা নিজেরা নিরাপদে থাকবে ও উত্তর প্রজন্মকে নিরাপত্তা দিতে সমর্থ হবে, তবে অতি বড়ো ভুল করা হবে। নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করতে হলে মুসলমান সমাজকে আত্ম-অধিকার বুঝে নিতে শিখতে হবে; এবং একাজ করতে গিয়ে কোনোরকম ভুল করা চলবে না। সবটাই করতে হবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাকে শিরোধার্য করে। এক্ষেত্রে তাদেরকে সবচেয়ে কঠিন লড়াইটা লড়তে হবে স্বসমাজের ছদ্ম সেক্যুলরদের সঙ্গে। এরাই তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ। আশা করা যায়, ভারতীয় সংবিধান রূপ রক্ষা কবচ ভারতীয় সংখ্যালঘু সমাজের স্বাধিকারকে শেষাবধি সংরক্ষিত রাখবে। সেক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে তাদের সপক্ষীয় প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করা; ভারতীয় অন্য সংখ্যালঘু সমাজের ক্ষেত্রে যে সমস্যা নেই বললেই চলে।

দৃষ্টিপাত

এমদাদ হোসেন

শিক্ষা, শিক্ষা এবং শিক্ষা

রায়হান আর এঞ্জেল ধর্ম নিয়ে আলোচনা করছিল। রায়হান বোঝাচ্ছিল, ইসলাম হচ্ছে সম্পূর্ণ আধুনিক ধর্ম। কিন্তু এঞ্জেল একেবারেই তা মানতে পারছিল না। এঞ্জেলের বক্তব্য, ইসলাম যদি আধুনিক ধর্ম হয় তাহলে মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার এত অভাব কেন?

রায়হানের মনে হল, এটা অবশ্যই ভাববার বিষয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা সত্যিই অনেকটা পিছিয়ে। কিন্তু কেন? কেন মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার এত অভাব? সত্যিই কি ইসলাম অশিক্ষিতদের ধর্ম? ইসলামের সঙ্গে শিক্ষার কি কোনো মৌলিক বিরোধ আছে।

রায়হান উপলব্ধি করে; না, তা একেবারেই নয়। ইসলামের ইতিহাস অন্তত তা বলে না। ইসলামের সূচনালগ্নের বৃত্তান্ত। একদিন হযরত মুহাম্মদ (স.) হেরা পর্বতের গুহার মধ্যে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন ছিলেন তখন ফেরেস্তা জিব্রাইল (অ.) সেখানে উপস্থিত হন। ফেরেশতাকে দেখে নবীজী (স.) ঘাবড়ে যান; এমন কাউকে তিনি প্রথমবার দেখলেন। ফেরেশতা তাঁকে বললেন 'ইকরা'; যার মানে 'পড়ো'। নবীজী বললেন 'আমি পড়তে জানি না।' ফেরেশতা ফের বললেন 'পড়ো।' নবীজী আবারও বললেন 'আমি পড়তে জানি না'। অতঃপর ফেরেশতা তাঁকে স্পর্শ করলেন, এরপর নবীজী (স.) পড়তে শুরু করলেন 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক।' এই ঘটনার পর নবীজী ভয় পেয়ে দৌড়ে তাঁর ঘরে চলে এলেন এবং বিবি খাদিজাকে (আ.) সমস্ত বিষয় অবগত করলেন। তখনও তিনি ভয়ে কাঁপছেন, ফেরেস্তা জিব্রাইল (অ.) তখনও আসমানে দৃশ্যমান। খাদিজা (আ.) উপলব্ধি করলেন ঘটনার তাৎপর্য; আশ্বস্ত করলেন স্বামীকে; আলাদা করে ওনাকে মোবারক জানালেন। সেই থেকে শুরু ইসলামের জয়যাত্রা।

এই ঘটনার সূত্রে প্রতিপন্ন হয়, ইসলামের মূল ভিত্তি শিক্ষা। নবীজী (স.) বলেছেন 'জ্ঞান অর্জন প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।' আর ফরজ মানেই অবশ্য করণীয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষার জন্য দূর দেশে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে বিশেষ করে। কিন্তু তারপরেও মুসলিম সমাজের মধ্যে শিক্ষার অভাব অত্যন্ত প্রকট। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের।

এখন প্রশ্ন; কোন শিক্ষাটা দরকার; শুধু কি দ্বীনি শিক্ষা, না দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষাও? আসলে দুটোই দরকার এবং দুটোর মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। এদিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে মুসলমান সমাজ এই দুই এর মধ্যে

কোনো একটার প্রতি বেশি পরিমাণ আকৃষ্ট হয়েছে এবং অন্যটাকে তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি। আর সেখানেই হয়েছে সমস্যা। অনেকে এটাও মনে করেন, শুধুমাত্র কোরআন শরীফ মুখস্ত করলেই হবে। এই ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। কুরআন পাঠ করতে হবে; জানতে হবে এর অর্থ; এটাও জানা দরকার, কোন কারণে, কোন প্রেক্ষিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল; এর মাধ্যমে আল্লাহতালা কি বলতে চেয়েছিলেন।

আল কুরআন এর স্থানে স্থানে বিধর্মীদের প্রতি চরম প্রতিহিংসা পরায়ণ হতে বলা হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের দেখামাত্র কোতল করার। শান্তির ধর্ম ইসলামের সাপেক্ষে এমন নির্দেশ অত্যন্ত অস্বস্তিকর। এদিকে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হলে এই অস্বস্তি দূরীভূত হয় নিমেষে। আসলে এখানে বিধর্মী সেইসব লোকেদের প্রতি ঘড়্গাহস্ত হতে বলা হয়েছে যারা ইসলামের ক্ষতিসাধনে বদ্ধপরিকর; সাধারণ অমুসলমান সমাজকে কিছুতেই এই নিদের্শের আওতায় আনা চলে না। মনে রাখতে হবে, আল কুরআন এর প্রত্যেকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এক একটি প্রেক্ষিতে। এই প্রেক্ষিতের সাপেক্ষে প্রযোজ্য হবে নির্দিষ্ট আয়াতসমূহ। এর ব্যতিক্রম করা হলে বিরাট ভুল হয়ে যাবে। এখন প্রায়শ ক্ষেত্রে যা হচ্ছে।

ইসলামের যথাযথ পাঠ নেওয়ার জন্য সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, অংক সহ যাবতীয় বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এখন বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি হচ্ছে তত বেশি করে আলোকিত হচ্ছে ইসলাম। অদ্যাবধি বিজ্ঞানের এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেই যা ইসলামের সত্যের সঙ্গে বিপরীত সম্পর্কে সম্পৃক্ত। বরং বাস্তচিত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত। একটা দিন ছিল, যখন মহাকাশ সম্পর্কে ইসলামে যা কিছু বলা হয়েছে তার সবই অলীক বলে মনে হত। এখন মহাকাশ গবেষণার প্রেক্ষিতে এতদিনের অলীক বিষয় চূড়ান্ত বাস্তবের মাটিতে পা রেখেছে। এমন উদাহরণের শেষ নেই।

মুসলমানদের একটা বড়ো দোষ; বিজ্ঞানের যে কোনো আবিষ্কারকে তারা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায়; বলে এ আর নতুন কী? আমাদের কোরানে চোদ্দশো বছর আগে এসব কথা বলে দেওয়া হয়েছে। কথা হল, বলা যেখানে ছিল সেখানে মুসলমানরা কেন এই আবিষ্কারটা করে দেখাতে পারলো না। এই আবিষ্কারটা তো তাদের পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক হত। একটা দুটো নয়, এমন অজস্র ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে একটু সচেতন হলে মুসলমনরা গুরুত্বপূর্ণ সব আবিষ্কার করে ফেলতে পারতো। সম্প্রতি জাপানী বিজ্ঞানীর গবেষণার সূত্রে প্রতিপন্ন রয়েছে রোজার ব্যবহারিক গুরুত্ব। সারা পৃথিবী অবনত মস্তক হয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে এই আবিষ্কার ও আবিষ্কারককে।

নিজের জিনিস নিজে ব্যবহার করতে না পারলে অন্যে তার দখল নেয়। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আল কুরআনকে মুসলমানরা তাদের চলার পথের পাথেয় করতে পারেনি; শো-কেসের সামগ্রীতে পরিণত করেছে। আমাদের হাফেজ সমাজের অধিকাংশ আল কুরআনের ন্যূনতম অর্থ অবগত নন। এর থেকে মারাত্মক আর কী হতে পারে!

তাই এখন দিন এসেছে, সব কিছুকে নিয়ে নতুন করে ভাবার। নতুন ভাবনার অনুসারী করে মুসলমান সমাজকে ভিতর থেকে গড়ে নেওয়ার।

কবিতা

র থী ন পা র্থ ম ণ্ড ল

খেলা

বারবার পড়ন্ত বেলা, পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্য
আর নারীর কনে দেখা আলোয় গোধূলি লগন আসে

যতনে সাজিয়ে রাখা শাড়ি খুলে রোদে মেলে ধরা
নিজস্ব উচ্ছ্বাস। আমার সম্মুখে শুধু ধুলো ও বাতাস

উষ্ণ আপ্যায়নের আড়ালে বিজ্ঞাপনী প্রচারের কৃতকৌশল
অনন্তকালের যত ধূসর পাণ্ডুলিপির যেন হবে উন্মোচন?

গোবেচারা রাখালের শেষ বাঁশি বেজে গেছে কবে?
এবার তোমার পালা
এভাবেই জলখেলার দিন শেষ হবে।

নিরন্ন জটিল অঙ্কে ভরপেট কেন সুখী নয়,
এ হিসাব মেলাতে বসে শুধু দেখি বিস্ময়।

কা জী গো লা ম গ উ স সি দ্দি কী

মৃত্যুর পরেও

মৃত্যুর পরেও মানুষ বেঁচে থাকে
দেহ মাটিতে মিশে যাওয়া বা চুল্লিতে পুড়ে গেলেই সব শেষ হয় না।
কেউ বেঁচে থাকে স্মৃতি সত্ত্বায়, কেউ বা কীর্তিতে

যখন মৃত্যুর মিছিল আসে মহামারি বা বিপর্যয়ে
তখনও আমারা হাসি, কাঁদি,অবিরল কাজের মধ্যে ডুবে থাকি
সে হতে পারে দেহ সৎকার বা দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো,
তার পরেও থেকে যায় রেশ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে
তাই মৃত্যুর পরেও মানুষ বেঁচে থাকে
অনেকটা, উপন্যাসের এক পর্বের যতি চিহ্নের মত, যেটা আসলে শেষ নয়

আবার রুদ্ধশ্বাস পরবর্তী পর্ব সমাপ্তির যতি চিহ্নের মত
তাই, জন্মজন্মান্তর থেকে মানুষ আজও ১৪ পুরুষ, যাদের নামও তারা জানে না,
তাদের জন্য বায়োবীয় সত্ত্বার আশ্রয় নেয়
স্মৃতি চারণ করে
আর, একবার জন্মালেই এভাবেই মৃত্যুর পরেও মানুষ বেঁচে থাকে, যতক্ষণ যা পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে

মুহম্মদ মতিউল্লাহ

ইফতার

বাবা বসে আছেন তাঁর পড়ার ঘরে মেঝেতে। চারিদিকে ছড়ানো-ছিটানো বইপত্র
মুখ নিচু করে বসে আছেন—রেহেলে খোলা আছে কোরআন শরিফ।
রোজার সন্ধ্যা নেমে আসবে আর কিছুক্ষণ পর
খোলা জানালা থেকে দেখা যায় অস্পষ্ট বোগেনভিলিয়া
দিনান্তে যে পাখি সন্ধ্যার আশ্রয়ে ফিরবে
এখনো তারা আকাশে ওড়াওড়ি করছে
কেবল একটি দুটি নিঃসঙ্গ কাকের ঘরে ফেরা..
সূর্যাস্তের শেষ আলোয় ঘর উঠোন শান্ত হয়ে আছে
অদৃশ্য ফেরেশতার অলৌকিক হাত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে
সারাদিনের নিরম্বু ব্রতপালন রোজা
বাবার মোনাজাতে দুলে উঠছে সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায়..

বাবা কতদিন নেই।

জি য়া হ ক

যাবতীয় দেশ

আজকে আমি কী দেখেছি
সকালরাত্রি দেশের ধারে
প্রণয়কুমার প্রণয়কুমার
বন্ধু হবে এই আঁধারে?

তোমায় আমি দিতেই পারি
অনেক মুক্তো অনেক প্রীতি
প্রণয়কুমার বন্ধু হওয়ার
মান্য যেসব নক্সা-রীতি

সে-সব আমরা বনাঞ্চলে
হারিয়ে ফেলব সজ্ঞানত
প্রণয়কুমার বিপদ ভিন্ন
রইল যৌথ কান্না যত

রাখতে হবে বৃষ্টিজলে
রাখতে হবে পৌষ মাসে
লোকচক্ষুর কাকপক্ষীর
পালকচোখের পথের পাশে

দুঃখ যখন সীতার মতো
শীত কাটাচ্ছে অশোক বনে
প্রণয়কুমার বন্ধু বানাও
নিয়োগ করো এ পার্বনে

যারা আমার নিকট-স্মৃতি
সুদূর-স্মৃতি যারা আমার
আমি তাদের খাদ্য হবো
দেশীয় হাওয়ার মৃত্যুখামার

আ জি বু ল সে খ

ভাতের লড়াই

শীত পড়েছে.....
উষ্ণতার কদর বেড়েছে
নিমোনিয়ার অভিশাপ ফুটে ওঠে
ধর্মতলায়, ফুটপাতে শত শত,
মন্দির, মসজিদের করিডোরে শায়িত
অগণিত বস্তুহীন, নিরন্ন ভারতবর্ষ।
আভিজাত্যহীন, চাকচিক্যহীন
কাঙাল জীবনে নামে কুয়াশার ভ্রূকুটি।
বিড়ি ফুকে লাঙ্গল কাঁধে নামে ভারতের মাঠে,
ভাতের চাষে ভাতহীন জীবন কেটে যায়।
তবুও সব ব্যথ্যা ভুলে আগামী প্রজন্মের
কথা ভেবে মাঠজুড়ে স্বপ্ন চাষ করে।

আজ তারা উপেক্ষিত,
কাস্তে হাতে, লাঙ্গল কাঁধে পার্লামেন্টের পথে।
সংবিধানে দোহারা চাষ দিয়ে দেখবে,
সত্যিই কি এখানে আম্বেদকরের স্বপ্ন ফলে?

উপন্যাস

মেকাইল রহমান

কাঙালনামা

নয়

এরপর কয়েক দিনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল। হৃদরোগ। বুক ধড়ফড়ানি। বাবা বৈঠকখানার আরাম কেদারায় সবে মাত্র বসেছিলেন দুপুরের আহার কোনোরকমে সেরে। খাওয়ার সময়েই তাঁকে অন্যমনস্ক চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ভাতের হাতটা যেন আর মুখে তুলতেই পারছিলেন না তিনি। বড়োবউ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, খেতে কি ভালো লাগছে না? কী চিন্তা করছেন, বাবা? নিরুত্তর নির্বাক বাবা অবরুদ্ধ আবেগে হঠাৎই আহার ত্যাগ করে হাত মুখ ধুয়ে আরাম কেদারায় বসে পড়েন ডাইনিং টেবিল ছেড়ে। ক্রমে চোখ বুজে এল তাঁর। ঠোঁট কাঁপতে লাগল। জিব শুকিয়ে গেল। বুক ধড়ফড় করল এবং তিনি খাবি খেতে খেতে জ্ঞান হারালেন। তাঁর খাবি খাবার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছিল তিনি যেন বলতে চাইছেন, বাঁচাও, বাঁচাও!

এখন বাড়িতে ছিল পুরুষ বলতে একমাত্র ধনেন্দ্র। তখন আর মান-অভিমান নয়, সে গাড়ি নিয়ে ত্বরিতে চলে গেল মাটিয়ায়, তুলে আনলো গৃহচিকিৎসক ডা. বল্লভ-কে।

রোগীর নাড়ি ধরে ডাক্তারবাবু বললেন, অন্তর তরঙ্গ।

এমন রোগের নাম তো কেউ কখনো শোনেনি। শুনে উৎকণ্ঠিত ধনেন্দ্র তো হা-হয়ে গেল।

ড. বল্লভ নিজেই ব্যাখ্যা দিলেন রোগের, ব্যাপারটা নদীর ঢেউয়ের মতো। নদী শান্ত তো ঢেউ বইবে তিরতির ছন্দে। নদীতে ঝড় উঠল তো ঢেউ হয়ে গেল উত্তাল তরঙ্গ। জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরটা তো নদীর মতোই!

ধনেন্দ্র জানতে চাইল, মানে?

ডাক্তারবাবু বললেন, কোনো কারণে উনি উদ্বিগ্ন। রক্তস্রোত ভাবস্রোতের মতো আলোড়িত ওনার অন্তরে। অনেকদিন ধরে ওনার রক্তচাপ ভারসাম্য রক্ষা করে না। চিন্তামুক্ত থাকলে উনি সুস্থই থাকতেন। হঠাৎ কি কোনো ঘোরতর চিন্তায় পড়েছিলেন কাঙালাবাবু?

বড়োবউ পাশেই ছিল। নালিশের সুরে সে জানালো, হ্যাঁ, বেশ কিছুদিন ধরে বাবা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন দামালকে নিয়ে। বাবার উদ্বেগচিন্তার শেষ নেই।

ডাক্তারবাবু দামালের ব্যাপারটা জানেন। তিনি চোখ তুললেন, কই, জানাওনি তো, ধনেন্দ্র! তুমি তো জানোই টেনশন ওনার সইবে না!

যেন হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে অপরাধী। মাথা হেঁট করে ধনেন্দ্র যেন দুশ্চিন্তার অথৈ সাগরে পড়ে গেল!

ডাক্তার ব্লাড-প্রেসার মেপে, বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে পরীক্ষা করে, একটা জীবনদায়ী ইন্‌জেকশান দিয়ে বললেন, রিস্ক নিয়ো না, ধনেন্দ্র। বারাসাতে নিয়ে যাও। কালীবাবুর নার্সিংহোমে ভর্তি করে দাও।

দুঃসংবাদ বায়ুবেগে ছোটে। গণরাজপুর ও ধনরাজপুরের লোক দলে দলে এসে ভিড় করল কাঙাল বাড়িতে। সকলের চোখেমুখে দুঃখ আর উদ্বেগের ছাপ।

দামাল ছুটে এসে কেঁদে পড়ল শয্যাশায়ী দাদুর পায়ে। 'দাদু, ও দাদু' বলে ডেকে সে ডুকরে ডুকরে কাঁদলো।

জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের জ্ঞান ফিরলো না তখনও।

দুপুর গড়িয়ে হল বিকেল।

ধনেন্দ্র অ্যাম্বুলেন্স আনলো। বাবার দেহে স্যালাইন ও অক্সিজেন চলল। সোরগোল পড়ে গেল সারা এলাকায়। বাবাকে বারাসাতে নিয়ে চলল ধনেন্দ্র।

দামাল বলল, আমি যাবো।

আপত্তি করল না ধনেন্দ্র।

অ্যাম্বুলেন্স ছুটল হুটার বাজিয়ে। পিছনে পড়ে রইলো নদীর ধারে শ্মশান পর্যন্ত বিস্তৃত ইটভাটা, সোনার হুলোর মেছো ঘেরি। দুপাশে রেললাইন সংলগ্ন তিন ফসলি জমির লপ্ত। সামনের গণরাজপুরের মোড়ের কাছে মজুত ঘরের ছায়া আর কবরতলার নৈঃশব্দও সরব হয়ে এক সময় পড়ে গেল পিছনে।

পিতৃপীড়নের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হল ধনেন্দ্র।

প্রেমেন্দ্র বলল, ধনেন্দ্র, বাবা বেশ সুস্থ ছিলেন। দামালকে নিয়ে তুমি বাবার সাথে যার পর নাই দুর্ব্যবহার করেছ। হয়তো তুমি বুঝতে পারোনি। কিন্তু আমি জানি, ভীষণ মনোকষ্ট পেয়েছেন বাবা। এখন ভাবো। তোমার মন কী বলে? দায় কি তোমার নয়?

যশেন্দ্র মারাত্মক রকমের ক্ষেপে গেল। সে হুঙ্কার দিল, এই ধাক্কায় বাবার যদি খারাপ কিছু ঘটে যায়, তবে তুমিও কিন্তু বাঁচতে পারবে না, মেজদা! দামালকে সবাই ভালোবাসে। সে সবাইকে বলে দেবে যে, তোমার কারণেই তার দাদুর এই অবস্থা। এখন দুটো গ্রামের উত্তেজিত মানুষ তোমাকে ধরবে। তোমাকে দেশছাড়া করে ছাড়বে। পালাবার পথ পারে না তুমি!

> আমার নিজের জন্যে আর কতটুকুই-বা প্রয়োজন? কার ভবিষ্যৎই-বা রক্ষা করছি আমি? নরেন্দ্র? সে তো এমন ভাব করে চলে গেল যেন যত দোষ সব আমার! ঘেরি, কল, ভাটা, স্টোর সর্বত্র আমি তো ভূতের বেগার খাটছি। দাদার কোনো খেয়াল নেই, সদানন্দ। ভাই তো বিন্দাস, জনমনোরঞ্জন করা ছাড়া তার জীবনের আর যেন কোনো উদ্দেশ্য নেই। তাদের চাহিদার যোগানে আমি কোনোদিন কোনো অভাব রাখি না। অথচ সমস্ত মাথার যন্ত্রণা আমার! বাবার কাছে খারাপ। একমাত্র ছেলে নরেন, তারও মন পেলাম না। তাহলে কীসের জন্যে কী করি আমি?

কিন্তু কী আশ্চর্য! কারো কথার কোনো প্রতিবাদ করল না ধনেন্দ্র। নিজের অন্তরে কি সে নিজেই পেয়ে গেল বিরাট একটা ধাক্কা? সে কি শেষে ধরা পড়ে গেল নিজের বিবেকের কাছে? বুঝি নিভৃত মনে ভয়ও পেয়ে গেল সে। বুঝি মনে মনে ভাবলো, সে অকারণে দামালের প্রতি হিংসা করে বাবার প্রতি অমন অনুচিত ব্যবহার না করলেই ভালো হতো! তার চিত্তচাঞ্চল্য দেখে বোঝা যায় এখন বাবা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সে নিজেই আর শান্তি পাবে না অন্তরে।

কাঙালবাড়িতে বিরাজ করল একটা থমথমে ভাব।

রাতে মেজোবউ ধনেন্দ্রকে বলল, মা মা বলে বাবা সুস্থ হয়ে নার্সিং হোম থেকে বাড়িতে ফিরে আসুন! তারপর সবাইকে নিয়ে বসে কথা বলে রাজ্যপাট তুমি ছেড়ে দাও।

ধনেন্দ্র পাগোলের মতো মাথা নাড়লো। মাথাটা যেন খারাপ হয়ে গেল তার। অনেক কথাই তার মনে জমছিল দু'দিন ধরে। মেজোবউয়ের কথা যেন কেটে দিলো মনের কথার বস্তার বাঁধন। হুড়মুড় করে তার মনের কথা বেরিয়ে পড়ল সব—বিষয়-আশয় ঘেন্যা ধরে গেল আমার! সম্পূর্ণ অকারণে বোকার মতো জীবনভর গাল কুড়িয়ে যাচ্ছি আমি। কী দরকার? আমার নিজের জন্যে আর কতটুকুই-বা প্রয়োজন? কার ভবিষ্যৎই-বা রক্ষা করছি আমি? নরেন্দ্র? সে তো এমন ভাব করে চলে গেল যেন যত দোষ সব আমার! ঘেরি, কল, ভাটা, স্টোর সর্বত্র আমি তো ভূতের বেগার খাটছি। দাদার কোনো খেয়াল নেই, সদানন্দ। ভাই তো বিন্দাস, জনমনোরঞ্জন করা ছাড়া তার জীবনের আর যেন কোনো উদ্দেশ্য নেই। তাদের চাহিদার যোগানে আমি কোনোদিন কোনো অভাব রাখি না। অথচ সমস্ত মাথার

যন্ত্রণা আমার! বাবার কাছে খারাপ। একমাত্র ছেলে নরেন, তারও মন পেলাম না। তাহলে কীসের জন্যে কী করি আমি?

তাড়া না খেলে বিড়াল গাছে ওঠে না! অনুতাপে ও নৈরাশ্যবোধে মর্মদগ্ধ হল ধনেন্দ্র। জ্ঞান নাকি মানুষের ফেরে না! অলক্ষ্যে বাবার অন্তরে থেকে বিশ্বজগতের সর্বনিয়ন্তা ভেলকিবাজ এমন ভেলকি দেখালো যে, ধনেন্দ্রর ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হল। ভেতর থেকে বদলে গেল বেচারা! নতুন উপলব্ধিতে তার একমাত্র কামনা এখন বাবার বিপদমুক্তি।

পরদিন সকালেই সে মেজোবউকে সাথে নিয়ে চলে এল নার্সিং হোমে।

তাদের দেখে অমনি উদ্বেল হয়ে কেঁদে ফেলল দামাল। কেন তার দাদুর জ্ঞান ফিরলো না এখনও?

ধনেন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, কালও বাড়ি যাসনি তুই?

দামাল বলল, না।

যে দাদু তার জীবন-প্রাণ, সেই দাদু তার নার্সিং হোমের বেডে। কী করে সে থাকে বাড়িতে?

তার দাদুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তিন তলার সুশোভিত কেবিনে। এখানে রাতদিন আয়াদের স্বযত্ন শুশ্রূষা। সর্বক্ষণ দেখভাল করছে দু'জন নার্স। তবু দামাল বাড়িতে ফিরল না। বলা তো যায় না, বাড়ির লোকের হঠাৎ যদি দরকার পড়ে! সে যেন হাঁকে ডাকে হাতের কাছে মজুত থাকতে পারে। সে যে দাদু বলতে অজ্ঞান!

ধনেন্দ্র তামালকে ডেকে নিয়ে উপরে উঠল।

মেজোবউ দামালকে জিজ্ঞেস করল, কী খাচ্ছিস তুই এখানে?

দামাল বলল, দাদু তো মুখে কিছুই তুলছেন না। দাদুর খাবারটা তিন বেলা আমি খাচ্ছি।

কেবিনের বেডে নাকে অক্সিজেন মাস্ক, হাতে স্যালাইনের সূচ আর দেহঢাকা সাদা চাদরের আচ্ছাদন ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়া পেচ্ছাবের নল ও বুকে আটকানো ইলেক্ট্রো-কার্ডিও গ্রাম মেশিনের কেবলের চাকতির কব্জায় চোখ বোজা নিথর বাবাকে দেখে ধনেন্দ্রর বুকের মধ্যে যেন উত্তাল ঝড় বয়ে গেল একটা। সে কেঁদে ফেলল।

মেজোবউ বলল, শান্ত হও। ঈশ্বরকে ডাকো।

ধনেন্দ্র আত্মসংবরণ করতে পারলো না। বাবার ঠাণ্ডা পা দুখানা জড়িয়ে ধরে সে সরোদনে ডাকলো, বাবা, ও বাবা, বাবা!

বারার চেতনা অতলান্তিক গোর থেকে সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হয়ে সামান্য নড়াচড়ার স্পন্দন তোলে।

ধনেন্দ্র সরোদনে বলে, আমাকে ক্ষমা করো, বাবা! চোখ খোলো। এবার থেকে তুমি যা চাইবে তাই করব আমি। কথা বলো, বাবা! তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ আর হবে না।

বাবা যেন সাড়া দিতে চেয়েও পারছেন না সাড়া দিতে। ডানদিকে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে তিনি বাম দিকে টাল খেয়ে পড়লেন।

ধনেন্দ্র বলে চলে, এই দেখো, বাবা, দামাল কাঁদছে। তোমার মেজোবউমা কাঁদছে। তুমি মুখ তুলে চাও, বাবা। একবার বলো তুমি সুস্থ হয়ে যাবে!

ধনেন্দ্র একেবারে দুমড়ে মষড়ে পড়ল মর্মযাতনায়।

নার্স এসে দেখলো চোখ মেলছেন রোগী।

ডাক্তারবাবু এসে দেখেশুনে বললেন, ডেনজার ইজ ওভার!

জীবন যে সুখ দুঃখের মালা, একই সুতোয় গাঁথা!

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিরলেন আর তারপর সাত দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফল বেরুলো দামালের। চোদ্দ পুরুষের দারিদ্র্য ও তজ্জনিত অপমান অনাদর লজ্জা গ্লানির প্রতিশোধ দামাল সুদে-আসলে উশুল করে নিয়েছে তার সাফল্যে। প্রায় এগারো লক্ষ ছেলেমেয়ের মধ্যে চতুর্থ হয়েছে দামাল। তার ঝকঝকে সবুজ সাথীটা চড়ে সে রেজাল্ট জানতে স্কুলে এলে সহপাঠীরা তাকে চ্যাংদোলা করে মাথায় তুলে নেচেছে। তার নিক্ষক-শিক্ষিকারা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমা খেয়ে আর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল সঞ্চালন করে আর পিঠ চাপড়ে সাবাস সাবাস করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছেন। শোহন স্যার এতটাই উত্তেজিত হয়ে গেলেন যে, দামালকে বুকে জাপটে ধরে আর যেন ছাড়তেই চান না। তাদের স্কুলে বরাবরই দু-চারজন ভালো ফল করে। সাতশোর মধ্যে ছ'শো চুয়ান্ন পর্যন্তও উঠেছে। কিন্তু ছ'শো চুরাশি পেয়ে ফোর্থ হওয়ার রেকর্ড এই প্রথম। সবাই জানতো দামাল ভালো কিছু করবে। কিন্তু এত ভালো যে সে করবে, তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। তাদের হেডস্যার তো বলেই দিলেন, দামাল যে কোয়ালিটির ছেলে তাতে ওর পক্ষে প্রথম হওয়াও অসম্ভব ছিল না!

কয়েক মুহূর্ত আনন্দের অতিশয় উচ্ছ্বাসে দম আটকে যাবার মতো হল দামালের। সুখবরটা এক্ষুনি দাদুকে না দিতে পারলে কোনো স্বস্তি নেই তার। সাইকেল চড়েই ঝড়ের বেগে সে স্কুল থেকে রাজ্য সড়ক ধরে বাড়ি চলে এল। একবাক্যে খবরটা মাকে আর মহিমাকে জানিয়ে সে উড়ে চলে এল তার দাদুর কাছে।

খবর শুনে তার দাদু যেন নবযৌবন ফিরে পেলেন। দামালকে বুকের পাটায় বাহুপাশে আগলে তিনি উল্লাসে ফেটে পড়লেন। তিনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে হাঁকডাকে সারা বাড়ি মাথায় করে তুললেন, ও বড়োবউমা, ও ছোটোবউমা, তোমরা কোথায় সব? ওরে নফরা, ডাক সবাইকে। ও মেজোবউ, তুমি এক্ষুনি ফোন করো ধনেন্দ্রকে। তাকে জানাও সুখবরটা। তাকে বলো, যাকে সে অবুঝের মতো হিংসা করেছে, আজ সে-ই করেছে রাজ্যজয়! ও গো, কই তোমরা? এত বড়ো আনন্দের খবর তোমরা এ জনমে আর পাবে না। এসো, দেখো আজ কেমন কামাল করলো আমার দামাল দাদুভাই!

তুমুল হাঁকডাকে যে যেখানে ছিল সবাই দ্রুত চলে এসে জড়ো হল বারান্দার বৈঠকখানায়।

বড়োবউমা স্নেহ-সোহাগের আতিশয্যে আজ সর্ব সমক্ষে বুকে জড়িয়ে ধরলো দামালকে। একান্তে অন্দরমহলে ডেকে দামালকে জড়িয়ে চুমো খেয়ে সোহাগ করে যে বাৎসল্যের ব্যাকুলতা মেটে না, আজ তার ষোলো আনা সুখের শিহরণে উদ্বেল হল বড়োবউ।

ছোটোবউ দামালের মুখ থেকে পাঁচ আঙুলের মাথায় রূপক চুম্বন নিয়ে নিজের মুখে খেলো।

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল বললেন, ও মেজোবউমা, তোমার বুকটা কি পাথর দিয়ে তৈরি? এখনও তুমি বুকে জড়িয়ে ধরলে না যে দামালকে!

এই তির্যক ভর্ৎসনায় মেজোবউ আর অটুট রইল না। বুকের পাথরটা তার ভেঙে গুড়িয়ে গেল। চোখের কোণে তার গড়িয়ে নামলো উষ্ণ অশ্রুধারা। দু হাত বাড়িয়ে সেব বলল, আয় বাবা, বুকে আয়!

দামালকে বুকে জড়িয়ে আত্মধিক্কারে ধরথরিয়ে কেঁপে গেল তার আপাদমস্তক।

সমানুভূতিতে কেঁদে ফেললো দামালও।

মেজোবউ নফরকে হুকুম দিলো, তুই যা, নফর, তোর মেজোবাবু ভাটায় আছে।

নফর হাবভাবের কোনো মাথা মুন্ডু বুঝতে পারে না। সে মুখ কাচুমাচু করে জানতে চায়, গিয়ে কী বলবো?

মেজোবউ বলল, কিছু তোকে বলতে হবে না। যা বলার আমি বলে দিচ্ছি ফোনে।

বেলা বাড়লো।

লোকে লোকারণ্য হল কাঙালবাড়ি।

দুটি গ্রাম নিষ্প্রাণ দুটি স্থানমাত্র হয়েছিল এতকাল। এ যাবৎ তারা পাশাপাশি পড়ে আছে মা মেদিনীর মতো সর্বংসহা হয়ে। যুগ যুগ ধরে একদিকের প্রবল প্রতাপ ক্ষুদ্রক্ষুণ্ণ করে রেখেছে অপরদিককে। কিন্তু কী হল আজ? দামালের অসামান্য সাফল্যে উঠেছে খুশির কলরব। বাঁধভাঙা স্রোতের মতো ঢল নামছে দুটো গ্রামের সাধারণজনের। মিলে মিশে সব একাকার। আজ যেন কেউ নেই পরাক্রমশালী, কেউ নেই পরাক্রান্ত। কেউ কারো মুখাপেক্ষী নয় যেন আর। নিষ্প্রাণ গণরাজপুর যেন প্রাণ পেয়েছে আজ। সে সগর্বে মাথা উঁচু করে যেন সবাইকে বলছে, দ্যাখ আমি গরিব বটে, কিন্তু আমার দামাল আছে, রত্ন! প্রাণ পেয়েছে ধনরাজপুরও। সে সোহাগে দুহাত বাড়িয়ে যেন সগৌরবে সবাইকে বলছে, আয় রে, কাঙাল বুক পেতেছে দরাজ! একটি আজ ভালোবাসার যোগ্য হয়ে ধন্য। আর একটি আজ ভালোবেসে ধন্য। এই সমাচার অনন্য ঢের ছড়ালো পাখির কুজনে গাছের শাখায় পত্র পল্লবে আলোতে বাতাসে।

চারিদিকে দামালের নামে ধন্য ধন্য রব উঠেছে অশেষ।

আবার জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল না থাকলে দামাল হয় না। তাই জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের প্রশংসায়ও পঞ্চমুখ সবাই।

দামালের আব্বা আনসার মোকামে লোকের মুখে শুনলো ছেলের কৃতিত্বের কথা। তার পাঁজরে যেন এক সঙ্গে অনেকটা বাতাস ঢুকে হাঁপর চলল হাওয়ার। আনন্দের চোটে

দম বেরিয়ে নাজেহাল সে। দামালকে এক পলক চোখে দেখার তীব্র ইচ্ছায় সে বাঁধা ভাড়া ছেড়ে ঝড়ের গতিতে ভ্যান চালিয়ে বাড়িতে ফিরেছে। কিন্তু বাড়িতে কোথায় দামাল? অগত্যা তাকে হনফন করে এসে উঠতে হয়েছে কাঙাল বাড়িতে। বিহ্বল জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল তাকেও জড়িয়ে ধরেছে বুকে।

ওদিকে দামালের মা খোদেজা সবার কাণ্ডকারখানা দেখে হকচকিয়ে গেছে। প্রথম শ্রেণির বিদ্যেও তার নেই। মাধ্যমিকে চতুর্থ হওয়ার মর্ম সে বুঝবে কী? মহিমা যতটা পেরেছে ততটা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করেছে।

তিনি উদ্বেলিত স্বরে বললেন, আমার হাহাকারে ভরা হৃদয় আজ অর্ধেক পরিতৃপ্ত! বাহ্যিক কিছু লক্ষণ দেখে আমি দামালকে যে প্রথম দর্শনেই রত্ন বলে চিনেছিলুম, আজ সেই আনন্দে মন ভরে যাচ্ছে আমার। অর্থের প্রাচুর্য ও অনর্থের বিড়ম্বনার মাঝে অটল থেকে আমি আগলে রেখেছি দামালকে যে আশা নিয়ে, সে আশা আজ আমার পূর্ণ।

তাদের কুঁড়ে ঘরের অঙিনায় এসেছে মিডিয়ার লোকজন। তারা খোদেজার প্রতিক্রিয়া জেনেছে, মহিমার বিবৃতি নিয়েছে, ফটো তুলছে কুঁড়েঘর সহ তাদের। তারপর তারা দামালের খোঁজে চলে এসেছে কাঙাল বাড়িতে।

সত্যি করে এক চাঁদের হাট বসে গেল জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের প্রশস্ত বৈঠকখানায় উঠোনে। বি. ডি. ও. সাহেব এসেছেন ফুল মিষ্টি নিয়ে। শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন এস. ডি. ও. সাহেব। স্বয়ং ডি. এম. দূত পাঠিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর শুভাশীষের সাথে দশ হাজার টাকার চেক। দামালের স্কুল থেকে হেডস্যারের নেতৃত্বে মাস্টারমশাইরা, দিদিমণিরা পায়ে হেঁটে নিয়ে এসেছেন দামালের মার্কশীট ও সার্টিফিকেট।

সকলকে নিজের হাতে মিষ্টিমুখ করালো ধনেন্দ্র। সেই দুপুরবেলা সে বড়ো বড়ো ডেকচি ভরে তার গাড়ি করে এনেছে তিনি-তিনটি দোকানের সমস্ত রসগোল্লা। নীরবে সে যেন আজ প্রমাণ দিচ্ছে নিজের যোগ্যতার। জ্ঞানেন্দ্র খুশি, কিন্তু মুখে কিছু বলছেন না। খবর শুনে প্রেমেন্দ্র ও যশেন্দ্রও বাড়িতে ফিরে মেতেছে আনন্দ-উৎসবে।

অনেক পরে খবরটা খোলসা করে শোনার পরে সব বুঝতে পেরেছে নফর এবং আনন্দের আড়ম্বর ঘটায় হদ্দ উল্লসিত সে।

সাক্ষাৎকার নিলো রিপোর্টাররা।

তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দামাল স্বীকার করল, কাঙাল দাদুর অনুপ্রেরণা ছাড়া আমার এই সাফল্য সম্ভব ছিল না!

তাকে আরো কিছু বলতে বলা হলে সে বলল, আমার নরেন্দ্র দাদা বলেছিল, পোভার্টি উইন্স লভ অ্যাণ্ড লভ উইন্স দ্য ওয়ার্ল্ড! কথাটা আমার মনে অব্যর্থ মন্ত্রের মতো কাজ করেছে। দাদু আমাকে ভালোবেসেছে। বড়োমা আদর উজাড় করে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে বুকে। আর দাদা আমাকে দিয়ে গেছে বিশ্বজয়ের মন্ত্র। এর বিপরীতে আমার দারিদ্র্য, মেজোবাবুর অসূয়া কিংবা নফর কাকার বিষফোড়ন সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। বড়ো ভালোবাসার সাথে টেক্কা দিতে পারেনি ছোটোখাটো ঘৃণা বিদ্বেষ।

–কোথায় ভর্তি হবে?

–আমার নিজেরই স্কুলে। এখানে আমাকে যাঁরা পড়িয়েছেন, তাঁরাই আমার জন্যে উপযুক্ত।

–এই...

–ভেরি সিম্পল।

–শুনি।

–টু বি অ্যাণ্ড টু ডু!

–মানে?

–দু'বছর বাদে হাইয়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে জয়েণ্ট এনট্রান্সে ভালো র‍্যাঙ্ক করে মেডিক্যাল সায়েন্স পড়ব কোলকাতায়। চেষ্টা করব ডাক্তার হয়ে ফেরার। আমাদের এলাকায় ভালো মানুষ আছেন, কিন্তু ভালো কোনো ডাক্তার নেই। এই অভাবটা পূরণ করতে চাই আমি।

দামালকে ছেড়ে রিপোর্টাররা ধরলো তার দাদুকে।

–বলুন, জ্ঞানেন্দ্র বাবু, আপনার অনুভূতি।

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল এবার যেন হয়ে উঠলেন সত্যিকারের রবি ঠাকুর। মাথার চুলে, ঘন বড়ো দাড়িতে, কপালের বলিরেখায় আর প্রশান্ত দৃষ্টির গভীরতায় যেন ঠিকরে বেরুলো তাঁর জ্ঞানের দীপ্তি। তিনি উদ্বেলিত স্বরে বললেন, আমার হাহাকারে ভরা হৃদয় আজ অর্ধেক পরিতৃপ্ত! বাহ্যিক কিছু লক্ষণ দেখে আমি দামালকে যে প্রথম দর্শনেই রত্ন বলে চিনেছিলুম, আজ সেই আনন্দে মন ভরে যাচ্ছে আমার। অর্থের প্রাচুর্য ও অনর্থের বিড়ম্বনার মাঝে অটল থেকে আমি আগলে রেখেছি দামালকে যে আশা নিয়ে, সে আশা আজ আমার পূর্ণ। এই দিনটারই যেন এতদিন আমি অপেক্ষা করে এসেছি মনে মনে। আমি নিশ্চিত দামাল বড়ো হবে। হয়তো একদিন নরেন্দ্রকেও ছাড়িয়ে যাবে সে। আমি আর থাকবো না সেদিন।

একটানা ভাবাবেগে কথা বলতে বলতে অশ্রুবাস্পে আচ্ছন্ন হল তাঁর কণ্ঠস্বর। এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে সবাই তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। যেন চোখের পলক পড়ে না তাঁর, শ্বাস পড়ে না খসে। একটু পরে আবার তিনি বলে চললেন, এখন আমি নরেন্দ্রর ফেরার অপেক্ষায়। সে এলে আমার ছুটি। সে ফিরে এসে বলবে জ্ঞান বড়ো না ধন বড়ো। এসে তাকে বলতে হবে সে দাদু চায় না বাবা চায়।

ফটোগ্রাফাররা তুলল নানা মুহূর্তের ছবি। (সমাপ্ত)

গল্প

মুহাম্মদ জিকরাউল হক

বাঁশ

নৌমানকে ফোন লাগালেন তারেক সাহেব। রিং হতে লাগল।

নৌমান আয়ুর্বেদিক ডাক্তার। চিকিৎসা এবং ওষুধ দুইই তার কাছে পাওয়া যায়। বছর তিনেক থেকে তার এই কারবার। যখন সে এই কারবার করবে বলে ঠিক করল, তারেক সাহেবের কাছে গিয়ে তার পরিকল্পনার কথা বলল। তিনি সব শুনে তাকে উৎসাহিতই করলেন। নৌমান বলল, 'আপনাকে কিছু টাকা ধার দিতে হবে। আমি সময় মতো আদায় দিয়ে দেব।'

তারেক সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কত দিতে হবে আমাকে?'

নৌমান বলেছিল, 'পঞ্চাশ হাজার দিলেই হবে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে নৌমানের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলেন তিনি। তিন বছর হয়ে গেল অথচ ওই টাকা ফেরত পাননি। বরং আরো কয়েকবার দশ-পাঁচ করে নিয়ে সেই টাকার পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে পঁচাশি হাজারে।

ফেরত দেওয়ার কথা তাকে কয়েকবার মনেও করিয়ে দিয়েছেন। সে বলেছে, 'দিয়ে দেব। আর ক'টা দিন সময় দিন।' তারেক সাহেব সময় দিয়েছেন। সেই সময় কবে শেষ হবে তিনি নিজেও জানেন না। অবশ্য তাঁর ততটা প্রয়োজনও ছিল না।

শুধু নৌমানকে নয়, কম-বেশি সাতজনকে তিনি টাকা ধার দিয়ে রেখেছেন। কাউকে কম, কাউকে বেশি। কেউ

সময় মতো দেয়, কেউ দেয় না। কেউ একবার ফেরত দিয়ে পুনরায় নেয়। এটাকে জীবনের অঙ্গ হিসেবেই ধরে নিয়েছেন তারেক সাহেব। এটুকু উপকার তো করতেই হবে! শিক্ষক মানুষ তিনি!

সবথেকে বেশি উপকার করেছিলেন জাহাঙ্গীরকে। তারেক সাহেব যখন এই অঞ্চলে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন তখন জাহাঙ্গীর খুব ছোট। স্কুল পড়ুয়া। যে বাড়িতে ভাড়ায় উঠলেন সেই বাড়ির পেছনের অংশে থাকত তারা। তার মা ও সে। বাবা মারা গিয়েছেন বছর দুই আগে। পেছনের অংশটা তাদেরই। সামনের অংশটা ছিল তার মামার। ব্যবসায় লস খেয়ে বিক্রি করে দিলে ভিনজেলার একজন শিক্ষক মকবুল হোসেন সেটা কিনে নেন। সেই শিক্ষকের অংশে থাকতেন তিনি। বহুদিন থাকার ফলে প্রতিবেশীর মত হয়ে গিয়েছিলেন। সুবিধা-অসুবিধায় একে-অপরের পাশে দাঁড়ানোটা তখন কর্তব্যের মধ্যেই পড়ত।

দীর্ঘ পাঁচ বছর থাকলেন তিনি এই বাড়িতে। মকবুল সাহেব একদিন বললেন, বাড়ি ছেড়ে দিতে। তাঁর বসবাসের জন্যই বাড়িটা দরকার। ছেড়ে দিলেন। গিয়ে উঠলেন পাশের এক বাড়িতে। আরো পাঁচ বছর কেটে গেল। মকবুল সাহেব বাড়ি বিক্রি করে ফিরে গেলেন নিজের জেলায়। সেই বাড়ি কিনে নিতে গেল জাহাঙ্গীররা। বারো লাখ টাকা দাম। ছয় মাস সময় নিলেন জাহাঙ্গীরের মা। জমি বিক্রি করে, সোনা বন্ধক রেখে নয় লাখ জোগাড় হল। পাঁচ মাস হয়ে গেল অথচ বাকি তিন লাখ টাকা জোগাড় করতে পারলেন না। নিরুপায় হয়ে তারেক সাহেবের কাছে গেলেন মা ও ছেলে। ধার চাইলেন টাকা।

তিনি বললেন, 'তিন লাখ টাকা! এত টাকা তো আমার কাছে নেই।' এত টাকা কাছে থাকার কথাও না। জাহাঙ্গীর বলল,'আপনি আপনার নামে পার্সোনাল লোন করে আমাদের টাকা দেন। আমরাই লোনের কিস্তি শোধ করব।' তিনি মুখের উপর 'না' বলতে পারলেন না।

স্কুল থেকে যাবতীয় কাগজ নিলেন, জাহাঙ্গীরকে সঙ্গে নিয়েই তিন-চার দিন ব্যাংকে গেলেন, ইন্সপেক্সন হল। সার্ভিস চার্জ লাগবে তিন হাজার টাকা। সেই টাকা জাহাঙ্গীরের কাছে নেই। তারেক সাহেব সেই টাকাও দিলেন। লোন হয়ে গেলে টাকা তুলে ব্যাংকেই জাহাঙ্গীরের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

বাড়ি কেনা হয়ে গেল। জাহাঙ্গীরের মা তারেক সাহেবকে গিয়ে বললেন,'ভাড়া যখন থাকতেই হবে, আমাদের নতুন বাড়িতে গিয়েই থাকো।' সেই বাড়িতে আগেও ছিলেন তিনি। ফলে রাজি হয়ে গেলেন। মাসিক ছাব্বিশ শো টাকা ভাড়ার বাড়ি ছেড়ে তিন হাজার টাকা ভাড়ার চুক্তিতে তিনি নতুন বাড়িতে উঠে এলেন।

মাসিক কিস্তি পড়ল সাড়ে ছয় হাজার টাকা। সেই টাকা কাটতে লাগল তারেক সাহেবের স্যালারি অ্যাকাউন্ট থেকে। বাড়ি ভাড়া তিন হাজার। বাকি সাড়ে তিন হাজার টাকা বাড়তি দিতে হতে লাগল তাঁকে। জাহাঙ্গীর কখনো দশ কখনো বিশ হাজার জমা দিয়ে ব্যাংকে লোনের পরিমান কমাতে লাগল। একসময় শোধ হল টাকা। শোধ হওয়ার পর দেখা গেল কিস্তি বাবদ প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার টাকা তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে কাটা হয়ে গেছে।

‘মানুষের উপকার করলে বাঁশ খেতে হয়’ একথা তারেক সাহেব শুনে এসেছেন এতদিন। কিন্তু বাঁশটা যে এত তাড়াতাড়ি তিনি খাবেন ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেননি। একদিন সুমন, তাঁর প্রাক্তন ছাত্র, ফোন করে বলল,‘স্যার, আমার এক বান্ধবী, বর্ষা, আমাদের এদিকে প্রাইমারী স্কুলে চাকরি পেয়েছে। সে ভাড়ার জন্য একটা বাড়ি খুঁজছে। আপনি এই ব্যাপারে একটু সাহায্য করবেন।’ তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, ‘অবশ্যই করবো। আশপাশে অনেক বাড়িই খালি পড়ে আছে। তাদের একটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।’

জাহাঙ্গীরের মা বললেন, ‘টাকাটা শোধ দেব ভাড়া থেকেই। তবে পুরোটা কাটলে আমাদের অসুবিধা হবে। ভাড়া বাবদ দু’ হাজার টাকা কেটে নিয়ে একহাজার আমাদের হাতে দিও।’ তাতেও তিনি রাজি হলেন। সেই টাকা শোধ না হতেই জাহাঙ্গীর এসে বলল, ‘মামা, সোনা বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছি। সেই টাকা শোধ দিতে হবে। আপনি পঁচাত্তর হাজার টাকা লোন করে আরেকবার দিন। আগেরবারের মত এবারও শোধ করে দেব।’

তারেক সাহেব আমতা আমতা করতে লাগলেন। একজনকে আর কতবারই বা এভাবে টাকা দেয়া যায়! তারপরও তিনি দিলেন। সেই টাকাও শোধ হল একসময়।

তারপর শুরু হল অন্যভাবে সাহায্য নেয়া। মাসের দশদিন না যেতেই আজ দু’শো, কাল পাঁচশো করে নিয়ে মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই ভাড়ার টাকা নেয়া হয়ে যায় ওদের। এটাকে তারেক সাহেব কিছুই মনে করেন না। দিতে যখন হবেই, হয় কিছুদিন আগে, নয় পরে!

মাসিক ভাড়া বেড়ে একবার তেত্রিশ শো হল। সেটা আরো একবার বেড়ে চার হাজার হল। দিন যাচ্ছে। ভাড়া বাড়বে এটাই স্বাভাবিক। তবে ভাড়ার যেখানে চাহিদা নেই সেই তুলনায় ভাড়াটা বেশিই হল। তাও তিনি মেনে নিলেন। বাড়ি চেঞ্জ করলে কম ভাড়াতেই বাড়ি পেয়ে যাবেন। অনেক খালি বাড়ি আশেপাশে। অনেকে ডাকেনও। কিন্তু সবকিছু নিয়ে টানাটানি করতে ইচ্ছে নেই বলেই তিনি বেশি ভাড়া দিয়ে এই বাড়িতেই থেকে গেছেন। তাছাড়া এতদিনের একটা সম্পর্ক।

‘মানুষের উপকার করলে বাঁশ খেতে হয়’ একথা তারেক সাহেব শুনে এসেছেন এতদিন। কিন্তু বাঁশটা যে এত তাড়াতাড়ি তিনি খাবেন ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেননি। একদিন সুমন, তাঁর প্রাক্তন ছাত্র, ফোন করে বলল,‘স্যার, আমার এক বান্ধবী, বর্ষা, আমাদের

এদিকে প্রাইমারী স্কুলে চাকরি পেয়েছে। সে ভাড়ার জন্য একটা বাড়ি খুঁজছে। আপনি এই ব্যাপারে একটু সাহায্য করবেন।' তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, 'অবশ্যই করবো। আশপাশে অনেক বাড়িই খালি পড়ে আছে। তাদের একটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।'

সেদিনই বিকেলে ওরা এলো। বাড়ি দেখতে। স্কুল করে আর ফেরেনি বাড়ি। তারেক সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি বাড়ি ফিরতেই তারাও এলো। তিনজন। সামনে গ্রীষ্ম। সকালে স্কুল হবে। বাড়ি থেকে এত সকালে এসে স্কুল করা সম্ভব নয়। তাই যত দ্রুত সম্ভব ভাড়া বাড়ি ঠিক করে এসে উঠতে হবে।

চা খেতে খেতে তারেক সাহেব স্ত্রী শিলিকে নির্দিষ্ট করে বলে দিলেন, কার কার বাড়ি দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। বর্ষা বলল, 'স্যার, আমি ইতিপূর্বে কোনোদিন কোথাও একা থাকিনি। এমন বাড়ি দেখুন যেন আমার কোন অসুবিধা না হয়। রান্না করাও জানি না তেমন। পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে পেলে আরো ভালো হয়।'

তারেক সাহেব শিলিকে বললেন, 'তবে মাফি চাচার বাড়ি নিয়ে যাও। ওরা এরকমই একজন ভাড়াদার খুঁজছেন।'

শিলি বর্ষাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমি বরং আমার কাছেই থেকে যাও। কোথাও যেতে হবে না তোমাকে।'

কথাটা শুনে বর্ষা হাতে চাঁদ পেল যেন। লাফিয়ে উঠল। বলল, 'আমি তাই বলতে চাইছিলাম ভাবি। আমি এখানেই থাকব। আপনার সঙ্গে রান্না করে খাবো।'

শিলি বলল,'দু' মাসের জন্য অন্যের বাড়ি থাকলে সবকিছু বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে আসতে হবে। খাট, বিছানা-চাদর, ওভেন-বাসনপত্র, অনেক ঝামেলা।'

তারপর তারেক সাহেবের দিকে ফিরে বলল, 'থেকে যাক কেমন?'

বড় ছেলে হোস্টেলে। ঘর ফাঁকাই আছে। থাকতে কোন সমস্যা নেই। দুটো মাস তো! তিনি বললেন, 'সমস্যা একটাই। কমোন বাথরুম। বর্ষা যদি মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারে তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।'

সুমন বলল, 'স্যার, এটা সবথেকে ভালো হবে। ও নিরাপত্তা পাবে।'

বর্ষা বলল, 'আমি আর কোথাও যাবো না স্যার। এখানেই ভাবির সঙ্গে থাকব আমি।'

তারেক সাহেব বললেন, 'তাহলে মালিকের সঙ্গে কথা বলে দেখি তারা কী বলেন। বাড়ি তো আমার না। আমিও ভাড়ায় থাকি।'

'হ্যাঁ স্যার, কথা বলুন। আমি আপনাকে ফোন করে খোঁজ নেব।' কথাটা বলে ফোন নম্বর নিয়ে উঠে পড়ল বর্ষা। উঠে পড়ল সকলে।

বাড়ির মালকিন আপত্তি করবেন না ধরে নিয়েই কথাটা বললেন তারেক সাহেব। তিনি বললেন,'তোমরা যদি মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারো তবে থাকো। আপত্তি কিসের। তবে ছেলের সঙ্গে কথা বলে দেখি, কী বলে ও।'

পরদিন সকালে বাড়ির মালকিন এসে জানালেন,'ছেলে বলেছে, আপনারা যে চার হাজার ভাড়া দিচ্ছেন তাই দেবেন, ওকে বলবেন দু'হাজার দিতে।'

'তার মানে বলতে চাইছেন, দু'জন মিলে ছয় হাজার ভাড়া তাই তো?'

মালকিন চুপ থাকেন। বোঝা যায় এটা তার ছেলের কথা হলেও সায় আছে তারও।

শিলি ফোঁস করে উঠে। বলে,'আপনাদের লোভ তো কম নয়। এ বাড়ির ভাড়া ছয় হাজার? কথাটা বলার আগে আপনাদের একবারও মনে হল না, এতবড় উপকার নিয়ে বসে আছেন, যখন কেউ আপনাদের টাকা ধার দেয়নি তখন আমরা পৌঁনে চার লাখ টাকা নিজেরা রিস্ক নিয়ে লোন করে দিয়েছি এই বাড়ি কিনতে, আর এখন এই তার প্রতিদান?'

মালকিন প্রথমে নিরুত্তর থাকেন। পরে বলেন, 'ছেলে যদি না মানতে চায় তাহলে আমি কী করব! ও আমার কোনো কথা শুনে নাকি!'

জাহাঙ্গীর যখন ব্যবসা শুরু করল, বহরমপুর থেকে মাঝেমধ্যেই ফোন করে বলতে লাগল, 'মামা! আমার নম্বরে তিন হাজার টাকা ফোনপে করে দেন তো। বাড়ি এসে দিচ্ছি আপনাকে।' তারেক সাহেব দিতেন। বার কয়েক দেওয়ার পরও যখন পুনরায় বহরমপুর থেকে ফোন করে টাকা চাইলো, বললেন, 'আমার সালারি অ্যাকাউন্ট। আমাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্টেটমেন্ট জমা দিতে হয়। আমি তো এভাবে রোজ-রোজ টাকা ট্রান্সফার করতে পারি না। ব্যবসা করলে টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।' সেই জাহাঙ্গীর এত উপকার নেওয়ার পরও কেমন করে এমন কথা বলতে পারে ভেবে অবাক হলেন তারেক সাহেব।

তারেক সাহেব বললেন, 'থাক, আর কথা বাড়াতে হবে না। বর্ষাকে বলে দিও অন্য কোনো বাড়ি দেখে নিতে।' ভীষণ খারাপ লাগল তাঁর। শুধু কি তাই? জাহাঙ্গীর যখন ব্যবসা শুরু করল, বহরমপুর থেকে মাঝেমধ্যেই ফোন করে বলতে লাগল, 'মামা! আমার নম্বরে তিন হাজার টাকা ফোনপে করে দেন তো। বাড়ি এসে দিচ্ছি আপনাকে।' তারেক সাহেব দিতেন। বার কয়েক দেওয়ার পরও যখন পুনরায় বহরমপুর থেকে ফোন করে টাকা চাইলো, বললেন, 'আমার সালারি অ্যাকাউন্ট। আমাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্টেটমেন্ট জমা দিতে হয়। আমি তো এভাবে রোজ-রোজ টাকা ট্রান্সফার করতে পারি না। ব্যবসা করলে টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।' সেই জাহাঙ্গীর এত উপকার নেওয়ার পরও কেমন করে এমন কথা বলতে পারে ভেবে অবাক হলেন তারেক সাহেব।

লোন করে যখন টাকা নিল, জাহাঙ্গীর তারেক সাহেবকে বললেন, 'কথাটা কাউকে বলবেন না মামা।' কাউকে তিনি এযাবৎ বলেননওনি। কিন্তু আজ তাঁর মনে হল, কথাটা বলা দরকার। ক'জনকে জানানো দরকার। তার মানসিকতার ঘৃণ্য দিকটা তুলে ধরা দরকার। তাদের বাড়ির সামনে যে মুদিখানা, সেই মুদির সলিমুদ্দিনকে বলবে বলে জাহাঙ্গীরের সামনেই তিনি কথা তুললেন।

তারেক সাহেব বললেন,'যখন কেউ টাকা ধার দিল না, আমাকে এসে ধরল, আমি লোন করে টাকা নিয়ে দিলাম, পৌনে চার লাখ টাকা, আর এখন সেই জাহাঙ্গীর সব সুবিধা নেওয়ার কথা দিব্যি ভুলে গেল।'

জাহাঙ্গীর বলে উঠল, 'এসব কথা এখন উঠছে কেন? এত বছর পর!'

'তুমি উঠিয়েছো বলে উঠছে।'

সলিমুদ্দিন বললেন, 'এত টাকা আপনি দিয়েছেন, জানি না তো!'

'কেই বা জানে! কাউকে জানালে তো? তবে এখন সবার জানা দরকার।'

'কী হয়েছে? কিছু হয়েছে?'

'একজন আমাদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল। শিক্ষিকা। মর্নিং স্কুল হবে। দূর থেকে এসে স্কুল ধরতে পারবে না বলে দুটো মাস ভাড়ায় থাকতে চেয়েছিল আমাদের সাথে। জাহাঙ্গীর বলেছে, আপনাদের চার হাজার বাদ দিয়ে ওকে মাসে আরো দু'হাজার দিতে হবে। তবেই থাকতে পাবে।'

ইতিমধ্যে আরো ক'জন এসে জড়ো হয়েছে। সলিমুদ্দিন বললেন, 'এটা কেমন কথা! উনি ভাড়া নিয়েছেন। কাকে রাখবেন না রাখবেন সেটা তাঁর ব্যাপার। এত কিছু সুবিধা নেওয়ার পরও এ কেমন মানসিকতা!' উপস্থিত সকলেই বলল, 'ঠিকই তো! এটা জাহাঙ্গীর ঠিক বলেনি।'

'সুবিধা শুধু আমি নিয়েছি? উনি নেননি? কম ভাড়ায় এত সুন্দর বাড়ি দিয়েছি। আগের বাড়ি থেকে তো তাঁকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিল। আমরা সেখান থেকে তাঁদের উদ্ধার করেছি।' জাহাঙ্গীর গলার স্বর উঁচু করে বলল।

তারেক সাহেব বললেন,'দেখো জাহাঙ্গীর। নিজের লজ্জা ঢাকতে অন্যকে মিথ্যা অপবাদ দিও না। কেউ আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করেনি। তোমরা বলেছিলে বলেই আমরা এসেছিলাম। যথেষ্ট বেশি ভাড়া দিয়েই এসেছিলাম। এখনো চার হাজার টাকা মাসে ভাড়া দিই। আছে আশেপাশে এত ভাড়া কোথাও?'

'চার হাজার টাকায় আপনাকে ছ'টা ঘর দিয়েছি। এত কমে কোথায় পাবেন? পাঁচ-সাড়ে পাঁচের ভাড়া আমার হাতে আছে। আপনি বেরিয়ে যান আমি বেশি ভাড়ায় লোক ঢুকিয়ে দিচ্ছি।'

আকাশ থেকে পড়লেন তারেক সাহেব। ছ'টা ঘর! তিনি জানতে চাইলেন,'ছ'টা ঘর? ছ'টা ঘর কোথায় পেলে তুমি? দু'টো বেডরুম আর একটা ছোট্ট মতো বৈঠকখানা।'

'চিলেকোঠা একটা। আপনি বাইক রাখেন একটা ঘরে। এগুলো ধরবেন না?'

'চিলেকোঠা? এটা ঘর? এর আলাদা করে ভাড়া লাগে? জানতাম না তো?'

'তাহলে তালা মেরে রাখেন কেন? খুলে দেবেন। আমরা ব্যবহার করবো।'

'ওটা সেফটির জন্যই তালা দিয়ে রাখতে হয়। আর বাইক রাখি তো তোমার সঙ্গে। তাও আড়াই বছর ধরে। আগে তো আমার বাইক ছিল না। বাড়ি ভাড়া দিয়েছো, গাড়ি রাখার জায়গা দেবে না? নাকি গাড়িটা মাথায় করে নিয়ে দোতলায় উঠতে হবে?'

সলিমুদ্দিন বললেন, 'এসব কথা বাদ দাও জাহাঙ্গীর। তুমি বাড়তি দু' হাজার টাকা চাওয়াটা ভুল করেছো। মাস দুয়েকের জন্য কেউ যদি থাকতে চায়, আর মাষ্টারমশাই যদি থাকতে দেন, তোমার আপত্তি কিসের? সুবিধা নিবে আর সুবিধা দেবে না, এটা হয় কখনো?'

'মাসে চার হাজার টাকা দিতে পারছেন না বলে আরেকটা ভাড়া ঢুকাচ্ছেন। দুই দুই করে দু'জনে চার হাজার দেবেন।'

তারেক সাহেব ফুঁসে উঠলেন,'কী বললে তুমি? মেয়েটার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে কোনো কথায় হয়নি আমার। সে দেবে কি না, কত দেবে সেটা তার ব্যাপার। দু'মাস তার থেকে টাকা নিয়ে ভাবছো আমার বিশাল টাকা বেচে যাবে। এতদিনে আমাকে এই চিনলে তুমি?'

'আপনি যে বলছেন, পৌঁনে চার লাখ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছি, সুদটাতো আমাকে দিয়ে হয়েছে নাকি?'

'সুদ তো তোমাকে দিতে হবেই। তুমি লোন করিয়েছো। সেটাও তো কেউ তোমাকে দেয়নি। নিজের রিস্কে সালারি অ্যাকাউন্ট দেখিয়ে লোন করে দিয়েছি, আমার অ্যাকাউন্ট থেকে মাসে মাসে সাড়ে ছ'হাজার করে কিস্তি কেটেছে, অথচ বাড়ি ভাড়া ছিল তিন হাজার। আমি কত টাকা বাড়তি শোধ করেছি জানো না?'

লোক জমে যায় একেক করে অনেকেই। তারাও দু'পাঁচ কথা বলে উঠে প্রয়োজনে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে

'সুদ তো তোমাকে দিতে হবেই। তুমি লোন করিয়েছো। সেটাও তো কেউ তোমাকে দেয়নি। নিজের রিস্কে সালারি অ্যাকাউন্ট দেখিয়ে লোন করে দিয়েছি, আমার অ্যাকাউন্ট থেকে মাসে মাসে সাড়ে ছ'হাজার করে কিস্তি কেটেছে, অথচ বাড়ি ভাড়া ছিল তিন হাজার। আমি কত টাকা বাড়তি শোধ করেছি জানো না?'

শিলি। তারেক সাহেবকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চায় বাড়ি। আসে জাহাঙ্গীরের মাও। তিনিও টানেন ছেলেকে বাড়ির দিকে। বলেন, 'বাড়ির কথা বাড়িতে হবে। সবার মাঝে কেন?' শিলি উত্তর দেয়, 'সেই পর্যায়ে রেখেছেন পরিস্থিতি? আপনাদের চেহারাটা মানুষের সামনে তুলে ধরাই দরকার।' একথাটা গায়ে লাগে জাহাঙ্গীরের। সকলের সামনে তার বড়ত্বের উচ্চতা ধসে যায় নিমেষে। সে বেপরোয়া হয়ে উঠে। বলে, 'টাকা দিয়ে বারো পার্সেন্ট সুদ খেয়েছেন তার বেলা?' এ কথায় ধাক্কা খান তারেক সাহেব। বলেন,'সুদ তুমি আমাকে দিয়েছো নাকি ব্যাংককে দিয়েছো?' জাহাঙ্গীর মুখের উপর বলে,'সে একই হল।'

শিলি একটা হ্যাচকা টান দেয় তারেক সাহেবকে। বলে,'চলো, নির্লজ্জদের সাথে কথা বলার কোনো মানে নেই। সাপের মুখে ঘা পড়েছে, ও এখন যেভাবে হোক ফোঁস মারার চেষ্টা করবে। বাদ দাও।' তারপর জনতার উদ্দেশ্যে বলেন,'জানেন, ওর নাতি হয়েছে। দেখতে যাবে। খালি হাতে যায় কী করে! হাতে টাকা নেই। পাঁচ পয়সা থাকেও না কখনো। মেয়ের বাড়ি হোক বা অন্য কোথাও, আমাদের কাছ থেকেই টাকা ধার নিয়ে যায়। আমাকে এসে বললো, তোমার ছেলের একটা আংটি দাও। নাতিকে দেখে আসি। কাউকে কিছু বলো না। আমি এক-দুই বছরের মধ্যে নাতিকে আংটি বানিয়ে দেব। আর তোমার আংটি ফেরত দিয়ে দেব। সেই আংটি আড়াই বছর পর ফেরত দিয়েছে।' তারেক সাহেব একরাশ ঘৃণা নিয়ে বাড়ি আসেন। সলিমুদ্দিনের দোকানে তখনো গুঞ্জন চলতেই থাকে।

লোকে বলে, উপকার করলে বাঁশ খেতে হয়। তিনি হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। তাঁর বাঁশ খাওয়ার আরো বাকি আছে। তিনি তো আর একজনকে টাকা ধার দিয়ে উপকার করেননি! করেছেন অনেককেই। সবার কাছ থেকেই বাঁশ তাঁর প্রাপ্য। তাই তিনি ফোন লাগিয়েছেন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার নৌমানকে। ওপার থেকে ফোন রিসিভ করে নৌমান বলল, 'হ্যাঁ, বলুন মাস্টার মশাই।'

তারেক সাহেব অত্যন্ত ধীরে ধীরে কেটে কেটে স্পষ্ট করে বললেন, 'বাঁশটা কবে দেবে? বাঁশ?'

নৌমান কথার আগাপিছু কিছুই বুঝতে পারে না। সে পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চাইলো, 'কি বললেন, বাঁশ?'

তারেক সাহেব বললেন,'হ্যাঁ, বাঁশ।' তারপর হা হা হা করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন।

কিছু না বুঝেই সেই হাসিতে যোগ দিয়ে হা হা হা করে নৌমানও হাসতে থাকে। তারপর কেটে কেটে সেও স্পষ্ট করে বলে, 'মাস্টার মশাই, সামনেই ইয়ার এন্ডিং। কোম্পানীকে টাকা শোধ দিতে হবে। কয়েকমাসের জন্য যদি কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা দিতেন তাহলে খুব উপকৃত হতাম। জানি, আপনি না করবেন না।'

গল্প

কালাম শেখ

লিবিডো

ঝড়ের গতিতে এসে উল্কাবৃষ্টির মতো ঝরিয়ে দিল।

ছেলেকে সাবধান করুন। ও খুব বেড়েছে। ফের কিছু করলে ওকে আমরা আর আস্ত রাখবো না। ওর মরা হাত পা গুলো ভেঙ্গে গুড়ো করে দেব। ও পাগল না সেয়ানা পাগল।— বলে আবার ঝড়ের গতিতে ভু —উ—উ করে বেরিয়ে গেল।

ধুমকেতু ! আ্য! ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠতে চশমা খুললেন। হাত দিয়ে দুচোখ কচলিয়ে মাথা ঝাঁকালেন শিবদাস বাবু। বাড়িতে এসে শাসিয়ে গেল! যতসব নচ্ছারের দল। রকবাজ। এত তর্জন গর্জন কিসের? অনুরাগ চোর, না ডাকাত? ও সন্ত্রাসী? কী করেছে অনুরাগ? জড়বুদ্ধির এক রত্তি ছেলে ভালোভাবে কথা বলতে পারে না। মুখ দিয়ে লালা ঝরে। মরা শিকটে অশক্ত হাত পা। হাঁটা চলা করতে পারে না। তাহলে কি দোষ করলো অনুরাগ?— নানা প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হন শিবদাস বাবু।

কিন্তু তখন নিরুত্তর থাকলেও কথাগুলো সারাক্ষণ কানে বাজে। পায়চারি করেন বারান্দায়। অস্থির চিত্তে ভাবনারা হাটে স্মৃতির ছায়াপথ পথ ধরে। হাঁটুর বয়সী ছেলেরা আজ শাসিয়ে গেল! ন্যূনতম সম্মানটুকু দিল না! নিজেকে ব্যর্থ শিক্ষক বলে মনে হয়। কী শিখিয়েছেন এতদিন? কী শিখেছে ওরা? একটা পাগল নিয়ে এত পাগলামি কেন? বাড়িতে এসে শাসিয়ে যাবে?

না কেউ ওদের খেলাচ্ছে। কিন্তু খেলাবে কেন? কারো সাথে তো কোন শত্রুতা নেই। সত্যিই কি অনুরাগ কোন

দোষ করেছে। একটা চলচ্ছশক্তিহীন জড়বুদ্ধি ছেলে। ও কী দোষ করতে পারে? শাসানোর কারণ খোঁজেন শিবদাস বাবু।

সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে সমাজের পাল্টে যাওয়া রূপটা দেখে শিউরে ওঠেন। হা হুতাশ করেন। কিন্তু কী করবেন একা। এখন শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা যেন অচ্ছুত হয়ে গেছে সমাজে। এদের একতা নেই। কোন প্রতিবাদ নেই। চোখ মুখ হীন। গলার স্বর নেই। চোখের দৃষ্টি নেই। বড়ো একা। সমাজবিরোধীরা সমাজ কব্জা করেছে। বাড়িতে এসে শাসিয়ে যাচ্ছে। এরা পাগল নিয়েও মাতামাতি করে। ফিরে গিয়ে কি ওরা অনুরাগকে আক্রমণ করল!

বিনা ! বিনা! ও বিনা!

বিনা দেবী তড়িঘড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘেমো মুখ, ভেজা হাত।

বাইরে এতো চেঁচামেচি হচ্ছিল কেন গো? কে এসেছিল?

বাজার পাড়ার দুটো ছেলে।

কী বলল ওরা ?

আজ থেকে অনুরাগকে বাইরে পাঠাবে না।

কেন? বাইরে পাঠাবো না কেন? কী দোষ করল অনুরাগ?

ওরা শাসিয়ে গেল। অনুরাগ কী করেছে কিছুই বলল না।

বাড়িতে এসে হম্বিতম্বি করলেই হল? কী করেছে অনুরাগ? ও ভালোভাবে কথা বলতে পারে না। হাঁটতে পারে না। এত কার কী ক্ষতি করল?

শিবদাস বাবু দুঃখের হাসি হাসলেন।—বুঝলে বিনু এখন পাগলরাও অপরাধী আর অপরাধীরা সাধু, সমাজপতি।

বিনা দেবী রাগ ঝরিয়ে বললেন, যারা কালপ্রিট, অপরাধী তাদের চোখে সবাইকে কালপ্রিট, অপরাধী মনে হবে । অনুরাগ কোনো দোষ করতে পারে না। কেউ এসে বললেও আমি তা বিশ্বাস করব না।

শিবদাস বাবু ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত। এখন দিনকাল দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। ঘোলাটে মনুষ্যত্ব। অপরের দুঃখে অনুকম্পিত হয় না মানুষ। মানবিকতার বেড়ি আলগা। ভেতরের পশুটাও স্বাধীন। অনুরাগকে অবলীলায় আক্রমণ করতে পারে ওরা।

তবুও আমার মনে হয় ওকে বাইরে কিছুদিন না পাঠানোই ভালো।

শিবদাস বাবুর কথায় সায় দিয়ে বিনা দেবী বললেন, সে ঠিক আছে পাঠাবো না। কিন্তু অনুরাগ এমন কি দোষ করল যে বাড়িতে এসে শাসিয়ে যাবে?

সুখের জীবন পেলেও কোন শান্তি পাননি শিবদাস বাবু। বৈভবের ভিতরে অশান্তির শিখা সারাক্ষণ পোড়ায়। সন্তানহীনতার বেদনার কাছে এ বৈভব যেন স্বাদহীন। ভবিষ্যতহীন এ জীবন। কি প্রয়োজন এত সবের যদি নেওয়ার কোনো উত্তরসূরী না থাকে?

একটা সন্তান লাভের আশায় আলেয়ার পিছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন শিবদাস

বাবু। আলেয়া! আলেয়া! সবই ঈশ্বরের মর্জি । মানুষের হাতে কিছু নেই। সব ললাট লিখন। নিয়তি। কিন্তু বিনা দেবী অকুতোভয়। জীবন মানে লড়াই করে বেঁচে থাকা। পলে পলে স্বপ্ন দেখা। আর আশা নামক হাতছানিকে স্মরণ করে জীবনের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া। রণে ভঙ্গ দেননি। ভাঙ্গা স্বপ্নের ভগ্ন স্তুপ থেকে গড়েছেন স্বপ্ন ঘেরা জীবন।

তুমি বেশি বেশি ভাবো। দেখবে একদিন না একদিন ঈশ্বর আমাদের সন্তান দেবে।

শিবদাস বাবু হা হয়ে শোনেন।—তুমি নিশ্চিত আমাদের সন্তান হবে?

ভক্তি ভরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর মানুষের আশা পূরণ করেন।

বিনা দেবী সন্তান ধারণ করলে আনন্দের বান ডাকলো সংসারে। শিবদাস বাবুর মুসড়ে পড়া মনটা আবার সতেজ হয়ে উঠলো। কত স্বপ্ন কত আশা কত কল্পনা, সব একাকার হয়ে গেল সন্তানকে ঘিরে। নতুনভাবে গড়লেন স্বপ্নসৌধ। অপার্থিব আনন্দে পিতৃত্বের সাধ অনুভব করলেন। সন্তানকে বড়ো করবেন নিজের মত করে।

ছেলে হোক আর মেয়ে হোক। মানুষ করবো মানুষের মতো।

তুমি শিক্ষক। তোমার সন্তান অফিসার হবে।

ভালো করে পড়াশোনা করলে অনেক কিছু হওয়া যায় বিনু।

আমি সেটাই বলছি শিক্ষকের ছেলে ডাক্তার হবে অফিসার হবে তাই না?

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই।

অনুরাগ জন্মানোর পর সব আশায় যেন জল ঢেলে দিল ঈশ্বর। লালিত স্বপ্নটা মরে গেল নিমেষে। অনুরাগ আর পাঁচটা ছেলে থেকে আলাদা। ও ঠিকভাবে হাঁটতে পারে না। কথাও বলতে পারে না। পা ধনুকের মতো বাঁকানো। হাত দুটো মিহি দুর্বল। অনেক চিকিৎসা করেও কোন সুফল পেলেন না শিবদাস বাবু। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিলেন, ছেলেকে সর্বদা মানুষের সাহচর্যে রাখতে হবে তাতে কিছুটা উন্নতি হতে পারে।

তাই করলেন। একটা হুইল চেয়ারে বসিয়ে বাজারের মোড়ে রেখে আসতেন। অনুরাগ খুব হাসিখুশি থাকতো। কিন্তু কি এমন হলো ! ছেলেগুলো বাড়িতে এসে শাসিয়ে গেল! অনুরাগকে বাজারের মোড়ে রেখে আসার আর সাহস পেলেন না।

কিন্তু বাড়িতে আর এক বিড়ম্বনা তৈরি হলো অনুরাগকে নিয়ে। ও আরো অস্বাভাবিক আচরণ করতে লাগলো। সারাক্ষণ রাগ দেখায়। গোঁ গোঁ শব্দ করে। লালা ঝরে ঠোঁটের পাশ দিয়ে। পোশাক পরতে দেখলে ওর অস্বাভাবিকতা আরো বাড়ে। শিবদাস বাবু ভিতরে ভিতরে পোড়েন। ধাক্কা লাগে বুকে। চোখ দুটো চিকচিক করে। যার চলার কোন শক্তি নেই সে কি করে মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

বাবা, তুমি আজ বাড়িতে থাকো। ফিরে এসে তোমাকে ঘুরতে নিয়ে যাব।—শিবদাশ বাবু অনুরাগের কপালে চুমু খেয়ে বললেন।

অনুরাগ না সূচক মাথা দোলায়। দুর্বল দুটো হাত দিয়ে শিবদাস বাবু জামা শক্ত করে ধরে। অসহায় জল ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। মুখের এক পাশ দিয়ে লালা চুঁইয়ে পড়ে। জামাটা ছাড়াতে গেলে অনুরাগ টাল খায়। মাটিতে পড়ে গোঁঙাতে থাকে। ওর অবস্থা

দেখে মনটা ভারী হয়ে ওঠে। ওর ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে আর কিছুই ভালো লাগে না শিবদাস বাবুর। কত স্বপ্ন দেখেছিলেন অনুরাগকে নিয়ে। স্কুলে নিয়ে যাবেন। দুচোখ ভরে দেখবেন নিজের সন্তানকে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। বুকে জড়িয়ে ধরলেন অনুরাগকে। তুমি বাইরে গেলে ওরা তোমাকে অপমান করবে যে! তুমি বাড়িতে থাকো, আমি ফিরে এসে বাইরে নিয়ে যাব কেমন?

ছেলের এই অসহায় করুন অবস্থা দেখে বিনা দেবীও কতদিন আড়ালে কেঁদেছেন। অনুরাগকে ভালো করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন দুবেলা।

বিনু তুমি কাঁদছো?

ভেতরের হাহাকার কে চাপা রেখে সান্ত্বনা দেন।— আমাদের অনুরাগ খুব ভালো ছেলে। তুমি কাঁদলে ও কষ্ট পাবে না ? আজ তুমি অনুরাগকে বারান্দায় বসিয়ে রাখো।

অনুরাগ হাত পা ছেড়ে অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে। আড় চোখে তাকায় শিবদাস বাবুর দিকে। চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে।

অনুরাগ বারান্দায় বসে দেখে নিচের রাস্তা খুব ব্যস্ত, কোলাহালময়। কত লোক,কত গাড়ি যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। ব্যস্তময় জীবন। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তারা ছুটছে। নিঃসঙ্গ অনুরাগ দেখল, পিঠে স্কুল ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলের পোশাকে একদল ছাত্রী হেটে যাচ্ছে চপল পায়ে। গায়ে সাদা শার্ট। পরনে লাল গাউন। মাথার চুল বিনুনি করা লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। যেন এক থোকা ফুল রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছে, আর সেই ফুলের রস ও গন্ধ গোগ্রাসে শুষে নিচ্ছে অনুরাগ। মেয়েগুলোর মাঝ থেকে একজন বলল, এটা ওই গতকালের মার খাওয়া পাগলের বাড়ি। দেখেছিস পাগলটাকে?

দেখবো না কেন। ও রাস্তার পাশে বসে থাকে। কেমন করে তাকায় আর হাসে। ও পাগল না ছাই।

অনুরাগের চোখ বিস্ফারিত হলো। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলো মেয়েগুলোর দিকে। মুখে এক চিলতে হাসি। অনুরাগ গো গো করে হাত তুলতে গেল আবেগে। কিন্তু পারলো না। ওর শরীরের অক্ষমতা ভুলে হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। একটা চোয়াল ভাঙ্গা গোঙানি। আঁ——। বিনা দেবী ছুটে আসলেন ভিতর থেকে।

তুই চেয়ার থেকে নিচে পড়ে কেন? বিনা দেবী কাঁদতে লাগলেন।— ভগবান আমার অনুরাগ কি কোনদিন ভালো হবে না ?

অনুরাগ পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে বিনা দেবীর দিকে। এক রহস্যময় দুর্বোধ্য ভাষাহীন চাউনি। ঠোঁট দুটো কাঁপে।

অনুরাগকে ধরে চেয়ারে বসালেন। চোখে মুখে হাত বোলালেন। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে দিলেন।

তোমার খুব লেগেছে বাবা? চুপটি করে আরেকটু বারান্দায় বসো। তোমার বাবা এসে তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবে।

বিনা দেবীও খুব চিন্তা করেন অনুরাগের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ওর কি হবে তাদের অবর্তমানে? দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খায় বিনা দেবীকে। ঘরে বউমা নিয়ে আসবে। বউমা, নাতি, নাতনি নিয়ে সংসার করবে।—সে আশা পূরণ হবে না কোনদিন। কে মেয়ে দেবে অনুরাগকে ? অর্থ সম্পদ মানুষের সব অভাব পূরণ করতে পারে না। আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। ভবিষ্যতের মহাশূন্যতা কুরে কুরে খায়। কে থাকবে এই বাড়িতে? কে দেখবে অনুরাগকে?

তাহলে তুমি বসে থাকো। আমি বাড়ির কাজ করে নিই। আজ আমরা তিনজনে ঘুরতে যাব। অনুরাগের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, আজ তোমার জন্য মাছের কালিয়া করেছি। তুমি খেতে ভালোবাসো। এখানে এনে দেব?

ঘোলাটে চোখে কেমন ভাবে চেয়ে থাকে বিনা দেবীর দিকে।

অনুরাগের এ চাউনি অপরিচিত বিনা দেবীর কাছে। রহস্যেভরা সে চাউনি।

কী হয়েছে বাবা তোমার? বারান্দায় বসে থাকতে ভালো লাগে না? ঘরে যাবে?

অনুরাগ বু—উ—উ শব্দ করে চেয়ার ঝাঁকানোর চেষ্টা করে।

বাড়িতে কয়েকদিন থাকার পর অনুরাগ আরো বেপরোয়া হয়ে উঠলো। খেতে দিলে খেতে চায় না। অস্বাভাবিক আচরণ করে। গো গো শব্দ করে বাড়ি মাথায় করে। কলেজ যাওয়ার সময় হলে অনুরাগ শিবদাস বাবুর জামা ধরে টানে। রাগ দেখায়। শিবদাস বাবু সিদ্ধান্ত নিলেন অনুরাগকে আগের মত আবার বাজারের মোড়ে রেখে আসবেন।

কি জাদু বলে অনুরাগ আবার শান্ত হয়ে গেল। ও আর রাগ দেখায় না। বাজারের মোড় থেকে ফিরে এসে আপন মনে হাসে। মনে কত জিজ্ঞাসা । অনুরাগ কিছু বলতে চায়, কিন্তু ওর দুর্বোধ্য ভাষা কেউ বুঝতে পারে না।

অনুরাগের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছো?

কী পরিবর্তন?

ও বাড়িতে এসে ড্যাব ড্যাব করে আমার দিকে তাকায় আর হাসে।

হয়তো ওর কোন স্মৃতি মনে পড়ে।

কিন্তু তবুও——।

তোমার সব আজগুবি ভাবনা। অনুরাগ কি স্বাভাবিক? ওসব তোমার মনের ভুল।

মনে রেখো আমি অনুরাগের মা এবং একটি মেয়ে। মায়ের চোখকে সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তোমরা যেমন মেয়েদের মনের ভাষা বোঝো মেয়েরাও ছেলেদের হাবভাব বুঝতে পারে।

একদিন একটা আচমকা কল পেলেন শিবদাস বাবু।

কে কে বলছেন!

আপনি শিবদাস বাবু বলছেন?

হা,আমি শিবদাস বাবু। আপনি কে বলছেন?

আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী বলছি। আপনার ছেলেকে এক্ষুনি নিয়ে যান। না হলে বড় বিপদ হতে পারে।

ওই ছেলেগুলোর শাসানো যেন আবার শুনতে পেলেন শিবদাস বাবু। ওদের অশ্রাব্য কথাগুলো কানে বাঁচতে লাগলো বারবার। অনুরাগের বড় ক্ষতি করে দিতে পারে ওরা। আতঙ্কিত হয়ে ছুটে গেলেন বাজারের মোড়ে।

অনুরাগ পড়ে আছে রাস্তায়। হুইল চেয়ারটা ভাঙ্গা। ঠোঁটের একপাশে রক্তের দাগ। বামদিকের চোখটা একটু ফোলা। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে অনবরত। চোখ দুটো আধাবোজা। বেঘোরে গোঙাচ্ছে অনুরাগ।

শিবদাস বাবুর চোখে জল চলে এলো। হু হু করে উঠলো বুকের ভিতর। অনেক স্বপ্ন অচিরেই মারা গেছে। অনুরাগকে নিয়ে আর কোনো স্বপ্ন দেখেন না। কিন্তু ওর কষ্ট সহ্য করবেন কি করে? নিজের সন্তান, হৃদয়ের নিঙড়ানো রক্ত।

কয়েকজন কড়া স্বরে বললেন, আপনার ছেলেকে আর এখানে রেখে যাবেন না। আপনি সম্মানী লোক। আমরা আপনাকে অপমান করতে চাই না।

কী করেছিল আমার ছেলে?

আপনার ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ও তো ঠিকভাবে কথাই বলতে পাবে. না।

আপনার ছেলে ঠিক ভাবে কথা বলতে পারে না? ও ছেলে সেয়ানা পাগল।

শিব দাস বাবু থ মেরে গেলেন। কী বলবেন আর কী করবেন ভেবে পান না। মনস্থির করলেন, অনুরাগকে কে আজ থেকে আর বাইরে পাঠাবেন না। বাড়িতেই রাখবেন।

বাড়িতে অনুরাগের আচরণ আরো অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো, রাগ দেখায়। মাথা নিচু করে আর আড় চোখে তাকায়। খেতে দিলে সহজে খেতে চায় না। গোমড়া মুখে গো ধরে বসে থাকে।

বিনা দেবী কেঁদে ফেললেন। ঈশ্বরকে তুললেন কাঠগড়ায়।—ভগবান,আমরা কী দোষ করেছি? আমাদের এত কষ্ট দিয়ে তোমার কী লাভ? অনুরাগের কী অপরাধ? ও কি ওর জন্মের আগে কোনো দোষ করেছিল? তুমি ওকে অথর্ব করে পাঠালে। এত বৈষম্য কেন তোমার কৃপায়?

সব ভাবনা তালগোল পাকিয়ে গেল এক নিশুতি গভীর রাতে। অনুরাগের ঘর থেকে ভেসে আসা গোঙানির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শিবদাস বাবুর। ঘর কাঁপানো বিকট শব্দ। অস্বাভাবিক। এ প্রতিদিনের চেনা শব্দ নয়। দুজনে ছুটে গেলেন অনুরাগের ঘরে।

অনুরাগকে দেখে যেমন ভীষণ ব্যথা পেলেন মনে আঘাত ও পেলেন সমানে। এ কি অবস্থায় দেখছেন অনুরাগকে। প্রায় নগ্ন। লাল দুটো চোখে যেন প্রবল আবেগের উদগীরণ। অশ্লীলতার আবহে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উদগ্র বাসনা। শিহরিত অনুরাগ কাঁপছে। কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিছানার চাদরটা জড়ো। বালিশটা লালায় ভেজা। শিবদাশ বাবু অবাক হয়ে দেখলেন ঘরের মেঝেয় পেড়ে আছে কয়েক জোড়া নারীর পোশাকহীন ছবি।

অনুভূতি

সৈয়দ হাসনে আরা বেগম

অস্তিত্বের আলো ছায়ায় সংখ্যালঘু নারী

আমার এই ঝর্ণা তলায় নির্জনে .../
সংখ্যালঘু আয়োজনে, শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে...

বিষয়টি আমাদের অনেকেরই জানা যে, সংখ্যালঘু বলতে শুধু মুসলিমদেরকেই বোঝান হয় না; জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পার্সি, শিখ প্রভৃতিও এর অন্তর্গত। শিক্ষার আঙিনায় সংখ্যালঘু তথা মুসলিম নারীদের কথা বলতে গিয়ে যার কথা না বললেই নয়, যিনি শতবর্ষেরও আগে চরম প্রতিকূলতার মাঝে তাঁর ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে গেছেন তিনি মহিয়সী নারী রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন। 'বিদ্যাসাগর' এর আর এক রূপ তিনি। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের সৃষ্টি শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল দেশবিখ্যাত। সেখানে বর্তমানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মেয়েরা পড়ার সুযোগ পায়। উপযুক্ত পরিমাণে তাঁর ভাবনার অগ্রগতি ঘটলে আজ মুসলিম মেয়েদের ভাগ্যের দিগন্ত উদ্ভাসিত হত। কিন্তু তা যে হয়নি, তা বলা বাহুল্য।

নারী হলো সমাজের অর্ধেক আকাশ! একটি নারীর সুশিক্ষা ছাড়া পরিবার, সমাজ বা দেশ উন্নত হতে পারে না। তাই পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরিকল্পনা ছিল প্রতিটি জেলায় মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য হোস্টেল তৈরি করা হবে। তারই ফলস্বরূপ ১৯৮৭ সালে মুসলিম গার্লস হোস্টেলের

ভিত্তি স্থাপিত হয় কলকাতায় ও বর্ধমানে। পরে নিরবচ্ছিন্ন হয় এই প্রয়াস। উল্লেখ্য এখনও পর্যন্ত পনেরোটি হোস্টেল চালু হয়েছে এবং আরো কয়েকটির কাজ চলছে। এইগুলির পরিচালক কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলার প্রতিটি দপ্তরের প্রধান আধিকারিকগণ। জেলাশাসক ও জেলা সভাধিপতিকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘুর আলাদা দপ্তর তৈরি হবার পর এখন প্রতি জেলার ডোমা (DOMA) সাহেব বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক। মোটামুটি ১৯৯২ সালে এই প্রতিষ্ঠানগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। সেই সময় বঞ্চিত জীবনের সঞ্চিত বেদনা বুকে নিয়েই বর্ধমান মুসলিম গার্লস হোস্টেলের অধীক্ষক পদে নিযুক্ত হই। যেখানে দায়িত্বের সীমা সম্প্রসারিত হয় খাতা কলমের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত। অসংখ্য ঘর ছাড়া কচি মনের সাথে জড়ানো, তাদের অনুভবের, ভালো মন্দের ছন্দের প্রতিটি খেলায় নিজেকে তাল মিলাতে হয়েছে। কর্মজীবনের বছর না ঘুরতেই নতুনের আসা, পুরানো ছাত্রীদের বিদায়; সবের মাঝে মনে হয়েছে—

> নইতো আমি মোটেই একা/আছে যে মোর তারকা রূপে/হরেক প্রতিভা চুপে চুপে/ভিন্ন গুণে হাজার আবাসিকা/চলতে চলতে পথের বাঁকে/দাঁড়িয়ে যাই তাদের ডাকে/ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরে/বাড়িয়ে দুই হাত/কখনো বিকাল, কখনো সাঁঝ/কখনো বা মাঝরাত/উঠসকালে দূর দূরান্তে/কেউ জানায় সুপ্রভাত।

যখন চাকরির ডাকে বাঁকুড়া জেলা থেকে আসি তখন চাকরিতো দূরের কথা শিক্ষিত মুসলিম মেয়ের সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। জমিদার বাবা সখের মাথায় কিছু বছর চাকরি করলেও, দিন বদলের ছোঁয়ায়, প্রয়োজনে, মনের টানে আমি চাকরিতে এসেছি। নীল রক্তের বেড়া ভেঙে অবাধ গতি বা সুযোগ কোনোটাই পাইনি। তাই আমার অনেক না পাওয়া জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি—মুসলিম মেয়েদের এই স্বর্গসুখ,যাতে আজও আমি বিভোর। এখানে থাকার জন্য চার্জ লাগে না, মিল আর মেন্টিন্যান্সের জন্য তখন মাসিক খরচ ছিল ২২৫ টাকা। এতোদিনে সর্বমোট খরচ ১০০০ টাকা মাসে। (সীট রেন্ট-৫০/টাকা সহ)। পুরোটাই বোর্ডের নির্দেশমতো। বিভিন্ন কর্মী (অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, কুক স্টাফ, গার্ড, সুইপার ইত্যাদি) নিয়ে আমাকে চালাতে হয়। তবে মেসিং এর দায়িত্ব মেয়েদের।

১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে দেখেছি সংখ্যালঘুদের স্কলারশিপের ফর্ম প্রতি জেলার ব্লকে যাবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্লক থেকে তা আর ইস্কুলে পৌঁছতো না বা ছাত্রীদের জানার সুযোগ হোত না, কোনো এক অজানা গাফিলতিতে। সবটাই চাপা থেকে যেতো। আমাদের প্রতিষ্ঠানে ফর্ম আসার পর আবাসিক মেয়েদের সাহায্য নিয়ে স্কলারশিপের বিষয়টি অনেককে জানানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। এখন সংখ্যালঘু দপ্তরের সূত্রে বিষয়টি বহুল প্রচারিত এবং সবাই সচেতন এ ব্যাপারে। এখন পূর্ণ সহযোগী দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ক্যাম্প করে অনলাইনে সময়মতো ফর্ম ফিলাপের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এতে সংখ্যালঘুরা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। সরকারিভাবে মাত্র ৬ টাকা

কিলো হিসাবে চালের বরাদ্দ আছে। চালের গুণগত মান বিচার করে নেওয়া না নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছা।

মেধাতালিকা অনুযায়ী পৌর এলাকার কলেজ বা স্কুলের ছাত্রীরা এখানে ভর্তির সুযোগ পায়। আর্থিক দিকটার উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বাংলাদেশী মেয়েও এখানে একসময় আবাসিক রূপে ছিল। প্রথমে সিট সংখ্যা চল্লিশ দিয়ে শুরু হলেও পরে বেড়ে একশো হয়েছে।

কর্মব্যস্ততার জোয়ারে ভেসে গিয়ে বাঁকুড়ার বাড়িতে যাওয়ার পরিমাণ কমে গেলেও ঘর ছাড়ার বেদনা চাপা পড়েনি কখনো; মেঘ না হয়ে বৃষ্টি হতে চেয়েছিলাম! তাই ঘরে বাইরে দায় দায়িত্বের সাথে তাল মিলিয়ে ক্লান্তিহীন এই পথ চলা—

> ক্লান্তি আমায় পারে না ছুঁতে/সজাগ করে তাদের ডাক,/থরে থরে সেজে উঠে/ভালোবাসার রঙীন ঝাঁক।/ঘর ছাড়িয়ে দম ফুরিয়ে/আসে সবাই এইআবাসে,/ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে/এগিয়ে যাই বহু আশে।/জুলজুলিয়ে তাকিয়ে থাকে/আঁখিতে তাদের স্বপ্ন রাখে;/হরেক আশায় দিন গুনে/হরেক অভিভাবক,/নিদেন পক্ষে তাদের মেয়ে/হয় যেন শিক্ষক।/ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার/নইলে বড় অফিসার; /হলে বেজায় খুশি।। তারা যে হয় অনেক সময়/শেষ সম্বল ঘুচিয়ে আসে,/ হাসতে জয়ের হাসি।

চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে পরিসর অনুযায়ী বর্তমানে আরও আটচল্লিশটি সীট বেড়েছে, বিভিন্ন সুবিধা বেড়েছে। বেড়েছে দায়িত্বের বহরও। এখানে মেয়েদের চলার পথ জুড়ে আমরা বিছিয়ে দিই অনুপ্রেরণার চাঁদর—

> সবার আগে রাখতে হবে/ভালো মানুষ হবার চেষ্টা,/ওইখানেতেই মিটবে তোমার চাওয়া পাওয়ারতেষ্টা/জিততে তোমায় হবেই জেনো/মাথায় রেখো ভালো কিছু ফন্দি/দেখবে তুমি হয়ে যাবে দামী ফ্রেমে বন্দী।

তাদের জীবনের সফলতা বা প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রাখি। কেউ কৃতী ছাত্রী হয়েও যখন আর্থিক প্রতিকূলতায় হোঁচট খেয়ে ঘুরে তাকায় আমার দিকে, তার না বলা কথার সবটুকু অনুভবে রেখে, নীরবে আপোষ করি। যখন চাকরি পেয়ে বা সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনসঙ্গী পেয়ে নতুন অধ্যায় শুরু করে, ওদের কৃতজ্ঞতার আলোটুকু যখন আমার সামনে রাখে, তখন তাজমহলের উজ্জ্বলতাও যেন ম্লান হয়ে যায়!

বিশেষ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে বা কখনো জেলার সংখ্যালঘু দপ্তরের সভায় আমন্ত্রিত হয়ে যাই। সভাশেষে দেখি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত সংখ্যালঘু নারী আমাকে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরে—সে আমার ছাত্রী, সন্তান, বন্ধু! বুকটা আমার ভরে উঠে; মনে হয়—'আমি যদি সৌধ হই/তারা যে মোর ভিত্তি/আমার ঘরে যত আলো/তারা যে তার দীপ্তি!'

এখানে আষ্টেপৃষ্ঠে কর্মসূত্রে জড়িয়ে রয়েছি। আর দায়িত্ব! দায়িত্ব পালনেই সার্থকতা—এ মন্ত্র আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সরকারী চাকুরে হিসাবে প্রতিমুহূর্তে কৃতজ্ঞতা রাখি। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনের মতো না হলেও ভালো প্রশাসক হতে গিয়ে—'কারোর কোনো বিশেষ গুণে/পেয়েছে কেউ ভালোবাসা বেশি,/আমি বড্ড কড়া শাসক/অধিকারের মাঝে রাখিনি রেশারেশি।' আমার শাসনের কঠোরতা আর হৃদয়ের মেল বন্ধনে নির্বিঘ্নে পথ চলেছি। এতোবড় প্রতিষ্ঠান চালাতে গিয়ে একই ছাদের নীচে এতো মনের প্রেম ও আড়ি ভাব, চাওয়া পাওয়া, অভাব অভিযোগ, ব্যস্ততা সবের মাঝেও অনেক কিছু—

> আমার ক্ষেতে আসে যে ভাই/কখনো ঝড়, কখনো খরা, বন্যা/সবের মাঝে তারাই হয়েছে বন্ধু/কখনো ভগীনি কখনো বা কন্যা/কত কিছুর সাক্ষী যে রয় কত মুহূর্ত,/জীবনটাকে গড়তে গেলে শৃঙ্খলতে রাখতে হবে গুরুত্ব।

অনুভবের দোলাচলে, ভালো মন্দে আমিও চলি—'তাদের যা মন্দ থাকে/ক্ষমায় মুড়ে রাখি দূরে/ভালোগুলোকে রাখি/গভীর স্নেহে, ভালোবাসায় মুড়ে।'

আমার এই ঝর্ণাতলায় বহমান ধারা—'আদর আর শাসনের পাশাপাশি নিরাপত্তায় সুরক্ষিত।—'আমি যদি আকাশ হই/তারা যে মোর তারা,/নতুন জীবন গড়তে তাদের/হয় যে নীড় ছাড়া/তাদেরকে বাদ দিয়ে/মোর পৃথিবী ছন্দ হারা!' কত অনুভবের, কত স্মৃতি বিজড়িত এই পথ চলা—

> যতই বলি থেকে যাবে/অনেক কিছু বাকী,/দুঃখ সুখের সমন্বয়ে/থাকবে সবার ভালোবাসার রাখী/তাইতো বন্ধু বিদায় বেলায়/অশ্রু কখন নীরবে এসে ভিজিয়ে যায়/তোমার, আমার, সবার আঁখি!

তারপরেও তাদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র সাত সমুদ্র, তেরো নদী পেরিয়েও—'দেশ বিদেশে ছড়ানো/তাদের যত ঠিকানা/হাত বাড়ালেই খুঁজে পাই—/বর্ধমান মুসলিম ছাত্রী আবাসের নিশানা।'

বিকাশকান্তি মিদ্যা

চৌকিদারের নিশিডাক

অনেক ভাই-বোনের মধ্যে ছোটো হওয়ার অসুবিধা অনেক, সুবিধাও প্রচুর।

সুবিধার তালিকায় প্রথম হলো মায়ের অবিচ্ছিন্ন সান্নিধ্য পাওয়া। বাবা-মায়ের দাম্পত্যে আর যেহেতু ছোটো কেউ নেই, তাই তাদের আর দাদা-দিদিদের আদর-ভালোবাসার অফুরন্ত ধারা তা-কুড়ানোর উপর বর্ষায়। রাতে মায়ের কাছে থাকার ক্ষেত্রে দাদা-দিদির তরফ থেকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। মায়ের কোলে তার তাই একচ্ছত্র আধিপত্য। রাতে মা আর আমার জায়গা রান্নাঘরের মেঝেয়। ঠিক ঢেঁকিটার পাশে। ঘর বলতে তো দেড়খানা। পিসিমার সঙ্গে ভাগে একটা, আর জ্ঞাতি জেঠিমারটা। অগত্যা তাই মায়ের সঙ্গে সারারাত, ধান ভাঙানো কুঁড়োর অদ্ভুত একটা গুমোট গন্ধে বিভোর। রান্নাঘরের কোণে বস্তায় জমানো হয় ধান ভাঙানো কুঁড়ো। তুঁষগুলো চলে যায় উনুনশালায়।

বস্তা ভরা কুঁড়োগুলো চালুনিতে চেলে হাঁস-মুরগীর খোরাক হওয়ার আগে পর্যন্ত আমাদের ফল পাকানোর জাঁক। কুঁড়োর মধ্যে একটু ডাসা আম পেড়ে এনে দুই থেকে তিনদিন রেখে দিলে পেকে যায়, আমড়াও তাই, সবেদাও। তবে সবেদাগুলো কেবল পাটের বস্তায় ঘসে উপরের খসখসে আবরণটা মসৃণ করে দিতে হত। ফল পাকানোর পদ্ধতিকে বলতে শুনতাম জাঁকে দেওয়া। জাঁকে দেওয়ার আরও একটা বড়ো উপাদান ছিল শ্যাওড়ার পাতা। শ্যাওড়ার কাঁচাপাতা খড়ের গাদায় জড়ো করে তার মধ্যে ফল দিলে পেকে যায় সহজে।

কচুপাতায় ছাগলের দুধ দুয়ে কয়েক ফোঁটা শ্যাওড়ার আঠা দিয়ে জমিয়ে দই করে খাওয়া ছিল আমাদের আর এক মজা।

আর গাছে পাকার আগে চোরের উপদ্রবে কাঁঠালি কলার কাঁধি কেটে আনতে হলে, কাঁচা ছড়াগুলো আলাদা করে দিয়ে দিত কার্বাইডের জাঁকে। ঘরের কোণে মাটির জালায় কোনো একটা পাত্রে অল্প একটু কার্বাইডে জল দিয়ে বসিয়ে দিত জালার তলায়। তারপব কলার ছড়াগুলো সাজানো হতো পরপর, শেষে চটের বস্তা দিয়ে মুখ ঢেকে বড়োজোর দুই কিংবা তিনদিন। কলা পেকে ঝুঁজিয়ে যেতো জালায়। আমাদের সেই প্রাকৃতিক খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণে কার্বাইড প্রথম রাসায়নিক।

তবে গাছে পাকার মুখে মুখে কলার কাঁধি কেটে আনলে, কার্বাইড ছাড়া সে কাঁধি দড়ি বেঁধে ঝোলানো থাকতো রান্নাঘরের আড়ায়। গাছে পাকলে ভামে খেত, ঘরে পাকলে মানুষ ভামের অভাব ছিল না।

সেই কাঁঠালি বা চাঁপাকলার গন্ধ, আম, আমড়া বা সবেদা পাকার গন্ধ ,কুঁড়োর গন্ধের সঙ্গে মিশে রাত বাড়লে ভারি হয়ে চেপে বসতো বুকে। কাঁঠাল আর তালপাকার গন্ধ এর সঙ্গে জুড়লে গন্ধের ঘনত্ব তীব্র হতো। চারদিকে জমাট বাঁধা অন্ধকার। জোনাকির ইতিউতি। একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাক।

জোনাকি এক আধটা যে ভুল পথে রান্নাঘরে ঢুকে যেত না, তা নয়। চারদিক তো খোলা। কিন্তু অমন আলোজ্বলা রহস্যময় পোকাটা ধরে একটু আধটু খেলা করবো,সে সব হবার উপায় নেই।

মা উঠতো 'রে রে' করে, বুড়োমা উঠতো বকে। কারণ কী, না, রাতে জোনাকি ধরলে প্রকৃতির ডাক পেয়ে বসে। এই রাতে, এমন অন্ধকারে নিয়ে যাবে কে?

বিজ্ঞান কী অপূর্ব ব্যাখ্যায় সংস্কার হয়ে সঞ্চারিত হত আমাদের মনে, জীবনে;আজ ভাবলে অবাকই লাগে। অথচ তখন দিব্যি তা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়েছিল। আলাদা করে ভাবার কোনো জায়গা ছিল না।

কার্তিক মাসে কালীপুজোর আট-দশ দিন আগে থেকে বুড়োমা পাখি পড়ানো করে দিত, এক ডাকে কেউ যেন ডাক না শুনি। কার্তিকী অমাবস্যা তো জানতাম না আমরা, আমরা জানতাম ওকে বলে 'বুড়ো অমাবস্যা'। যত রাজ্যের শ্মশান-মশান, ভাগাড়-গোপাড় থেকে দুনিয়ার ভূত-প্রেত, শাকচুন্নি-পেত্নী, স্কন্ধকাটা-গলায়দড়ে, গুমোট-গোভূত সব বেরিয়ে পড়তো এই সময়।

কেবল ভূত-প্রেত নয়, ওঝা-গুণীন, চোর-ডাকাত,ডাইন-ডাক, মন্দ মানুষেরও এই সময় রমরমা। ভূত চতুর্দশীতে তাদের সব কারিকুরি, তুকতাক, ওষুধ সংগ্রহ। ভূতের চেয়ে তাদের ভয় বেশি। কে কখন চুল কেটে নেবে, গায়ের থেকে তুলে নেবে একটুখানি ময়লা। সর্বোপরি, এক ডাকে ডাক শুনলে প্রাণবায়ুটা কোন মুখ কাঁটা ডাবের খোলের মধ্যে ভরে নিয়ে, জলের তলায় লুকিয়ে রেখে মাছ দিয়ে খাওয়াবে, কে জানে?

ভয় তো কেবল বুড়োমা দেখায় না, যদি কিছু না থাকবে, বিভূতিভূষণ আতুরি ডাইনির কথা লিখতে যাবেন কেন? অপু তো তখন বেড়ে উঠছে আমার গায়ে গায়ে, মনে মনে।

স্মৃতির সঙ্গে যদি বাস্তবের মুখোমুখি দেখা আর না হয় কখনও, স্মৃতির মতো বড়ো আর কিছু হতে পারে না। সেই বয়সের মনের পরিধি দিয়ে তো মাপা সব কিছু, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনের ওই মণিকোঠাটা অপরিবর্তিতই থাকে। ঠিক যেমন শৈশবের সেই অন্ধকার।

ঘরের আলো নিভিয়ে, পর্দা টেনেও আজ নাগরিক-রাতে অন্ধকার আনা দুস্কর যখন, তখন উপমা বিহীন শৈশবের সে অন্ধকার। আমরা বলতাম ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। নিজের হাত-পা-ও দেখা যায় না, এমনই নিকষ। কেবল তারার আলোয় পথ দেখা।

তারাও ফুটতো আকাশে! যেন কনকচূড় ধানের খই। বৈশাখ থেকে কার্তিক, এই সময় সারা আকাশ জুড়ে তারার হাট বসে যায়। আকাশের তারা দেখে বুড়োমা বলে, তারা যত ঘন, চাষবাস ততো দড়। কিন্তু সে হলে তো বাঁচা যেত। হয় কই?

রাতের খাওয়া বা ক্ষুন্নিবৃত্তির পর উঠোনে নামতে সাহস হয় না একা। সব সময় নিজের পিছন দিকটায় ভয় বেশি। সেই ভয় নিয়ে রাত আটটা ন'টার পর উঠোনে নামলে আকাশে ফ্যাৎ ফ্যাৎ শব্দ। শব্দ শুনলেই তো ভয় লাগে। তার উপর বুড়োমা বা বিধবা পিসিমা যখন বলতো, ও আর কিছু নয়,শর যাচ্ছে। ভূতে শর ছাড়ছে,তখন গায়ে কাঁটা দেওয়া থামায় কে? কোনভাবে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় যেতে পারলে বুঝি ধড়ে প্রাণ ফেরে।

ওসব আসলে রাতচরা পাখি কিংবা চামচিকের উড়াউড়ি ছিল, আজ বুঝি; কিন্তু সেদিন ওই অন্ধকারে, ওই আওয়াজে আমাদের তল্লাটের সবাইয়ের কাছে ভূতের বাস্তবতা নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না।

আলো বলতে ল্যাম্প। বড়ো জোর এক আধটা হ্যারিকেন। টর্চের বিলাসিতা খুব কম মানুষের। পেট্রল ম্যাচও দু'একজনের পকেটে।

এঅবস্থায় আগুন জ্বালানোর বড়ো উপায় দে-কাঠি। দেশলাই কাঠি নয়, এ তার ক্ষুদ্র সংস্করণ। এক বিঘৎ মাপে পাটকাঠি ভেঙে নিয়ে, সেটাকে বাটনা বাটা নোড়া দিয়ে থেতলে নিলে একটা টুকরো দিয়ে অনেকগুলো টুকরো বেরিয়ে যেত। আগুনের মালসার উপর ঝিনুক রেখে, তাতে দেওয়া হতো গন্ধকের টুকরো। সে গন্ধক কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের তাপে গলে গেলে, পাটকাঠির টুকরোগুলোর দুই মুখ ওই তরল গন্ধকে চুবিয়ে রেখে দিলেই শুকিয়ে দে-কাঠি।

সেই দে-কাঠি গুচ্ছ ভরে বেঁধে রাখা হতো রান্না ঘরে ঝুলিয়ে। শোওয়ার সময় মা মাথার কাছে রাখতো আগুনের মালসা। আর দে-কাঠির গুচ্ছ। আগুন সংরক্ষণের দেশজ পদ্ধতি। এবার মাঝরাতে যদি ল্যাম্প জ্বালানোর দরকার হয়, অন্ধকারে, অভ্যাসেই মায়ের হাত ঠিক চলে যায় দে-কাঠির বান্ডিলে। সেখান থেকে একটা কাঠি ছড়িয়ে আগুনের মালসার মধ্যে চালিয়ে দিলেই জ্বলন্ত আগুন। তা দিয়েই জ্বলে উঠবে ল্যাম্প। কেটে যাবে অন্ধকার।

কিন্তু চারপাশের ওই ঘুরঘুট্টে মনের মধ্যে যে অন্ধকার জমিয়ে তোলে তা কি এত তাড়াতাড়ি যায় নাকি?

কোনোদিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙে, পেটে অস্বস্তি, মনে সংশয়, জোনাকি ধরার ফল না তো? কোনোদিন ঘুম ভাঙে শিয়ালের ডাকে। ঝাঁক বেঁধে ডাক। 'সহজ পাঠ'-এর পংক্তি নয়, গ্রামের সহজ ছবি এটাই। বিড়ালে বিড়ালে মুখোমুখি,রেষারেষি হয়ে গেলে সে আওয়াজ থামার নয়। বিড়াল, না বাচ্চার কান্না, বোঝা দায়। বুঝতে না পারাটাই যে চেপে বসে বুকের মধ্যে। ঘুম আর আসে না কিছুতেই।

তারপর ঘুম যদি আসলো কোনো ভাবে, তো, মাঝ রাত নাগাদ আবার বিঘ্ন।

—মা, ও মা, কী যেন ডাকে?

সারাদিন সংসারের কাজ আর ঢেঁকি পাড় দেওয়ার ক্লান্তি, তবু মায়ের ঘুম যেন হাঁড়িতে ভাতের জল চাপিয়ে দিয়ে আসা। এক ডাকেই তড়াক।

—কী যেন ডাকে মা!

—কোথায়?

—ওই যে হৈ ই ই ই.....

—ওরে হতচ্ছাড়া, ও তো চৌকিদারের হাঁক। সারা বছর হাঁকে। ঘুমো, ভীতু কোথাকার।

বুড়োমার ভাষায়, সোনার দেশে বলে চুরি ডাকাতি বাদ যায় না, তো আমাদের এই মড়াখেকো গাঁ-গঞ্জে!

এক বেলা অন্ন জোটানো দায় যেখানে, সেখানে পৃথিবীর আদিম প্রবৃত্তির এ ধারা বন্ধ থাকে কী করে? ডাব-নারকেল,কলা-কচু সরিয়ে দেওয়া তো হাত সাফাই বলা চলে। জল ভাত। হাঁসটা, মুরগীটা, চোখে ধরা নধর পাঁঠা কিংবা খাসিটা চোখের আড়ালে গায়েব করে দেওয়াটাও কোনো ব্যাপার না। দিনের আলোয় অসুবিধা হয় না এসব করতে। কারণ খাওয়া না জুটলেও তাড়ি-মদের মতো নেশার বস্তুটা তো জোটাতেই হয়, ফলে...। আর এসবের সঙ্গে পুকুরের মাছচুরি তো আছে, চাল-ধান থেকে থালা-বাসন, মায় বাটনা বাটার শিল-নোড়াও, এর সঙ্গে সিঁদকাটারও চল। সিঁদেলের মতো ছিঁচকে চোরেরও অভাব নেই।

আর সেটা যে সব সময় নেশার কারণে হয়, এমন নয়। পেটের জ্বালা যে কী ভয়াবহ, ধরা পড়লে হাট-পিটানি হবে জেনেও ঝুঁকি নিতে পিছপা হয় না। নেশার মতো অভাবের পাশাপাশি স্বভাবেও হয় এসব। আর হয় যখন,গৃহস্থকে তাই সতর্ক করতেই হয়। নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমালে চলে না। বাসে পকেটমার উঠলে কন্ডাক্টর যেমন বার বার ভাড়া চেয়ে সতর্ক করে, গণেশ চৌকিদার আর অতুল দফাদার তেমন যেন আমাদের কন্ডাক্টর।

রাত তৃতীয় প্রহর হলো সেই মহার্ঘ সময়। গৃহস্থকে জাগানোই তাদের কাজ। পদবী অনুযায়ী পাড়া ভাগ গাঁ-গঞ্জে। পাড়ার মুখে এসে পদবী ধরেই ডাকা, জেগে আছে কিনা খোঁজ নিয়ে জাগিয়ে দেওয়া।

নির্জন রাত, তারা ভরা আকাশ। ঝিঁঝি পোকার বিরতিহীন আওয়াজও জমাটবাঁধা অন্ধকারে মিশে গিয়ে তৈরি করে গভীর নৈঃশব্দ। সেই নৈঃশব্দের বুক চিরে চৌকিদার আর দফাদারের পালা করে ভেসে আসা 'হালদারের পো,... নস্করের পো, জেগে আচো?' আওয়াজ, ঘুমের মধ্যে কানে এসে যখন পৌঁছায়, পিল্লা ওঠে চমকে।

মাঝরাতে ঘুমের ঘোরে চৌকিদারের অমন অতর্কিত নিশিডাক শুনলে, বাচ্চা তো বটে, বুড়ো হাড়েও কাঁপন ধরে যেত।

অন্ধকারের ফুসফুস থেকে শ্বাস টেনে তৈরি সে আওয়াজ হারিয়ে গেছে কবে!

দফাদার তো বটেই চৌকিদারিও আজ আর নেই। রাত পাহারা দেয় আর জি পার্টি । সে পার্টিও উঠে গিয়ে এখন পার্টির ছেলেরাই দেখভাল করে। তাদের হাতেই সব, চৌকিদারের নিশিডাকের জায়গা এখন অতর্কিত বোমার আওয়াজে মুখরিত।

বঙ্গদর্পণ

আব্দুল বারী

সুচি শিল্পের সেকাল

একটি দেশের, একটি জাতির বা সমাজের আত্ম পরিচয় হল তার লোকসংস্কৃতি। এখানে 'লোক' শব্দটি ব্যক্তি বিশেষ নয়; সমগ্র। একটা বিস্তৃত অঞ্চলে বসবাসকারী মানব সম্প্রদায়। তাদের চিন্তা-চেতনা বিশ্বাস ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রকাশই তার সংস্কৃতি। এই লোকসংস্কৃতির শেকড় সমাজ ও জীবনের খুব গভীরে প্রোথিত। কর্ষণ কথা থেকেই কৃষ্টি কথাটি এসেছে। কৃষ্টি বা সংস্কৃতি হল মানব মন কর্ষণ জাত ফসল। তাই বলতে পারি লোকসংস্কৃতি মানব মন ও সমাজ কর্ষণ জাত ফসল।

বহু প্রাচীন কাল থেকে এক সমৃদ্ধ লোক সংস্কৃতির দেশ এই বাংলা। শিল্পের কত যে শাখা প্রশাখায় ধারা উপধারায় শিকড়ে বাকড়ে গ্রামীণ জীবনকে, দেখার জগৎকে প্রকাশ করেছে মানুষ তার ইয়াত্তা নাই। লোকসংস্কৃতির হাজারো ধারার (লোকসংগীত, লোকসাহিত্য প্রভৃতি) একটি হচ্ছে লোকশিল্প। এই শিল্প ও নানা ভাগে বিভক্ত। অন্য শিল্পকলার কথা না হয় বাদই দিলাম। যদি শুধুমাত্র হস্তশিল্পের কথাই বলি তাহলে বলতে হয় নানা কথা। যেমন বেত শিল্প, কাঠ শিল্প, বাঁশ শিল্প, চামড়া শিল্প, বুনন শিল্প, লাঙল বাঁধা, গাড়ি বাঁধা, ঘর ছাওয়া, সূচি শিল্প ইত্যাদি।

বর্তমানে গ্রামের মানুষের এই অকৃত্রিম শিল্পকলা, তাদের মনের সহজ সরল ভাবনার প্রকাশগুলি বিশ্ব সংস্কৃতির আগ্রাসনে, কৃত্রিমতায় হারিয়ে যেতে বসেছে। বিশেষ করে গ্রামীন মেয়েদের হাতের সূক্ষ্ম সূচি শিল্প।

সূচ সুতোর সাহায্যে গ্রামের মেয়েরা নিজেদের স্বপ্ন কল্পনা দুঃখ বেদনা আশা ভালবাসা এক টুকরো কাপড়ের উপর কিংবা কাঁথার উপর লতিয়ে দিত। অসীম ধৈর্য আর নিষ্ঠার সাথে সূচের ফোঁড়ে ফোঁড়ে ফুটিয়ে তুলত তাদের মনের গোপন আবেগ, সহজাত শিল্পভাবনা। প্রকৃতি লগ্না নিরক্ষর এই মহিলারা উপাদানের স্বল্পতায়, হাতের কাছে যেটুকুই উপকরণ পেত তা দিয়েই চিরন্তন শিল্পকর্ম নির্মাণ করত। মনে শিল্প ভাবনা না থাকলে, ধৈর্য না থাকলে তা গড়ে তোলা সম্ভব না। তাদের তৈরি এসব সামগ্রীর প্রয়োজন ছিল। গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সামগ্রীই তারা তৈরি করতো। কিন্তু সেই প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরির মধ্যেও তাদের শিল্পী মনের ছোঁয়া লেগে থাকতো।

প্রথমে কাঁথা পাড়ার সময় যে মাপ নেওয়া হয় সেলাইয়ের পর তা অনেকটাই কমে যায়। এই কমার হিসাব করেই মেয়েরা হাত মেপে এই কাঁথা পাড়ত। তাই কাঁথা ছোট হয়ে যাওয়া বা মাপসই না হওয়ার সুযোগ থাকত না।

প্রথমে কাঁথা নিয়ে আলোচনা করব। সংস্কৃত 'কন্থা' শব্দ থেকে কাঁথা শব্দটি এসেছে। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন 'কঁথা' শব্দ থেকে কাঁথা শব্দের উৎপত্তি। 'কঁথা' শব্দের অর্থ হল ত্যানা বা পুরনো কাপড়ের টুকরো।

আগের দিনে পুরনো কাপড় স্তরে স্তরে সাজিয়ে নিয়ে সূচ সুতো দিয়ে সেলাই করে তৈরি করত কাঁথা। পুর হিসাবে কাঁথার বিভিন্ন ভাগ আছে। তিন পুর থেকে শুরু করে সাতপুর পর্যন্ত কাঁথা তৈরি হত। অল্প শীতের জন্য পাতলা কাঁথা (তিন, চার পুরের), আবার ভারী শীতের জন্য মোটা কাঁথা। ভারি শীতের জন্য যে মোটা কাঁথা তৈরি হতো তা সাত পুরেরও বেশি। পুর তৈরি হতো মূলত ছেঁড়া শাড়ি ধুতি লুঙ্গি সুতির জামা কাপড় ইত্যাদি দিয়ে। ভেতরে নানা ধরনের ছেঁড়া ফাটা কাপড় দিলেও উপর এবং নিচের কাপড়গুলো অপেক্ষাকৃত নতুন দেওয়া হতো। কখনো কখনো বাজার থেকে ছাঁট কাপড় কিনে নিয়ে এসে তা দিয়েও কাঁথা বনানো হতো। এই কাঁথা বিভিন্ন সাইজের। সাত হাত কাঁথা, পাঁচ হাত কাঁথা প্রভৃতি মাপে কাঁথা মেয়েরা তৈরি করত। আবার বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন আকারের কাঁথা তৈরি হত। একদম ছোট বাচ্চাদের জন্য খুব পাতলা পাতলা দোলাই। এই দোলায়ে ছোট বাচ্চারা পায়খানা প্রস্রাব করে দিলে কেচে মেলে দিলে অল্প সময়েই শুকিয়ে যেত। ব্যবহার করার খুব সুবিধা। এখন দোলায়ের ব্যবহার কমে এসেছে। ঘরে ঘরে এখন ডায়পার এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। আবার বাচ্চা একটু বড় হলে দেড় দুই হাতের ছোট ছোট খুব সুন্দর কাপড়ে তৈরি কাঁথা দেওয়া হতো। আরও একটু বড় হলে তার আবার আলাদা মাপের কাঁথা থাকত। অর্থাৎ একদম ছোট থেকে বড়দের বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন মাপের এই কাঁথা তৈরি করতো।

প্রথমে কাঁথা পাড়ার সময় যে মাপ নেওয়া হয় সেলাইয়ের পর তা অনেকটাই কমে যায়। এই কমার হিসাব করেই মেয়েরা হাত মেপে এই কাঁথা পাড়ত। তাই কাঁথা ছোট হয়ে যাওয়া বা মাপসই না হওয়ার সুযোগ থাকত না।

প্রথম দিন কাঁথা পাড়ার কাজে গ্রামীণ কোন দক্ষ মহিলাকে ডাকা হত। সেই দক্ষ মহিলা প্রথমে এসে কাঁথার কাপড় পেতে দিয়ে যেত। উঠোনে বা বড় বারান্দায় কাঁথা পাড়ার আয়োজন হতো। স্তরে স্তরে কাপড় সাজিয়ে নিয়ে তারপর চারিদিক দিয়ে সেলাই করে নিত। পরে বড় বড় ফোঁড় তুলে সেলাই করত। একে বলতো সত্তা

দেওয়া। কাঁথার চারিদিকের কিনারে কাপড়ের সুন্দর সুন্দর পাড় দিয়ে সেলাই করা হতো। যাতে করে কাঁথার চার কিনারা শক্ত থাকে। আর সুন্দর নকশাদার পাড় দিয়ে চারিদিক আটকানো থাকলে তার সৌন্দর্য আলাদা হয়।

এভাবে প্রথমে ত্যানা বা কাপড়গুলোকে আটকে নিতো, তারপর অবসর সময় বুঝে কাঁথা সেলাই এর কাজ চলত। কাঁথা সেলাইয়ের জন্য বাজার থেকে সুতো কিনে এনে বাড়িতেই তা পাকিয়ে নেওয়া হতো। অনেক সময় বাজারে পাকানো সুতো কিনতেও পাওয়া যেত। বিভিন্ন কাঁথার জন্য বিভিন্ন ধরনের সুচ ব্যবহার করা হতো। পাতলা কাঁথার জন্য মাঝারি সুচ আর সাত পুরো বা তার থেকে মোটা কাঁথার জন্য শক্ত মজবুত বড় সুচ ব্যবহার করত। সেলাই করতে গিয়ে হাতের মধ্যমা আঙ্গুল যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য কাপড় দিয়ে মধ্যমা আঙ্গুলের মাপে একটি আংটা তৈরি করে নিত। এই আংটার উপর সূচ রেখে ঠেলে ঠেলে কাঁথার মধ্যে সুঁই চালনা করে ফোঁড় তুলত।

বর্ষার সময় কাঁথা সেলাই এর কাজ বেশি হতো। সে সময় সংসারের কাজের একটু চাপ কম। ঝরঝর করে বৃষ্টি ঝরছে। চারিদিক কেমন যেন আঁধার আঁধার। ধোঁয়া ধোঁয়া। হাতে তেমন গৃহস্থালির কাজ নেই। কাঁথা নিয়ে বসে পড়তো। কখনো দুই তিনজন মিলে কখনো বা একাকি। বিষন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে মনের গভীর থেকে উঠে আসতো আপন কল্পনা। তাই বুনিয়ে চলতো সূচ সুতোয়। কোন দিন স্বামী, পুত্র, শ্বশুর, দেওয়রের খাওয়া শেষে অল্প আলোয় কাঁথা নিয়ে বসত। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অসীম ধৈর্য আর নিষ্ঠার সাথে সূচের ফুঁড়েফুঁড়ে বুনে চলত কল্পনার জগৎ। বাইরে আকাশ থেকে নিঃশব্দে ঝরে পড়ত শিশির। দূরে কোথাও গাছে বা বাড়ির চালার উপর ডেকে উঠত পেঁচা। রাত্রি জানান দিত শেয়াল। সেদিকে খেয়াল থাকত না এই সব শিল্পী মানুষদের। আপন খেয়ালেই বুনে চলত মনের গোপন কথাগুলি।

এই কাঁথা সেলাই করতে অনেক দিন সময় লাগত। অবসর পেলে কেউ কেউ দু এক মাসেই একখানা কাঁথা সেলাই করে ফেলত। আবার কারো কারো বছর, দু বছর লেগে যেত। গ্রাম জীবনে কাঁথা সেলাই করার এক অলিখিত প্রতিযোগিতা চলত। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে এই স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা আমি ছোট বয়সে দেখেছি। কেউ একখানা সুন্দর কাঁথা সেলাই শেষ করলে সেই পাড়ার অন্য কোন মেয়ের মধ্যে তার কাঁথাখানা সেলাই শেষ করার একরোখা ভাব আসতো। সেও চাইতো খুব দ্রুত ওরকম একটি কাঁথা সেলাই শেষ করে ফেলতে। গ্রামীন জীবনে বাস না করলে, এ সমস্ত নিরক্ষর মহিলাদের সঙ্গে সময় না কাটালে, এইসব মেয়েদের মনের কথা বোঝা যায় না। এখন অনেককেই দেখি দূর থেকে দাঁড়িয়ে গ্রাম জীবন, তার অন্তরঙ্গ ছবি আঁকার চেষ্টা করছে। বড় মেকি আর নিষ্ফল সেই প্রচেষ্টা।

গ্রামে গ্রামে তখনো তুলোর লেপ সেভাবে আসেনি। খুব কম মানুষে তুলোর লেপ ব্যবহার করার সৌভাগ্য লাভ করত। কারণ একটা লেপ বানাতে বেশ কিছু গাঁটের কড়ি খরচ হয়। তাই কাঁথার উপর মানুষের নির্ভরতা ছিল অনেকখানি। শুধু নিজেই ব্যবহার করত তাই নয় ভালো ভালো কাঁথা তৈরি করে তুলেও রাখত। বাড়িতে নতুন জামাই এলে

বা কোন আত্মীয় পরিজন এলে পেতে দিত। সেই কাঁথা তাদের পরিবারের ঐতিহ্য সম্মানের ধারা বহন করত। আবার কারো মেয়ে বড় হলে মায়ের চিন্তার শেষ থাকত না। বিয়ে দিয়ে মেয়ের বিদায়ের সময় ঘর সংসারের নানা জিনিসের সঙ্গে বেশ কিছু কাঁথা কাপড়ও দিতে হত। নতুন বউ এলে পাড়ার লোক হাড়ি কড়ায় থালা-বাসনের সাথে কাঁথা কাপড়ও দেখতে আসত। সুন্দর দুই একখানা নকশাদার বা সুজনি কাঁথা থাকলে সেই কথা পাড়াময় মেয়ে মহলে উড়ে বেড়াতো। মেয়ের মা দাদি যে বড়ো গিন্নী সে কথা উঠত। এই নকশী কাঁথার জন্য নতুন বউ যেন একটু সমীহ, সম্মানের পাত্রী হয়ে উঠত। নতুন পরিবেশে, নতুন বাড়িতে প্রথম দিনই তার একটা আলাদা মর্যাদার আসন এনে দিত এই নকশী বা সুজনি কাঁথা। সামান্য জিনিস। কিন্তু মেয়ে মহলে তার কি অসীম স্থান। অজানা বাড়ির মেয়ে কত সহজেই চিহ্নিত হত গিন্নি বাড়ির মেয়ে বলে।

এই কাঁথা সেলাই এর সময় বিভিন্ন ফোঁড় ব্যবহার করা হত। সাধারন কাঁথা ও নকশি কাঁথার ক্ষেত্রে এই ফোঁড়ের তারতম্য আছে। এই ফোঁড়ের ব্যবহার বা সেলাইয়ের ধরন না জানলে ভালো কাঁথা তৈরি করা যায় না। বিশেষ করে সুজনি ও নকশি কাঁথা। এমনই কতগুলো ফোঁড় হল ক্রস ফোঁড়, ডাল ফোঁড়, চেন ফোঁড়, রান ফোঁড়, ডবল রান ফোঁড়, বেঁকি ফোঁড়, সাটিন ফোঁড় প্রভৃতি। আগের দিনের মেয়েরা এতসব নাম মনে রাখত না। জানতোও না বোধ হয়। তারা সহজ সরল ভাষায় গোটা টোপ, ভাঙ্গা টোপ, শাট সেলাই, চেন সেলাই, লহর সেলাই, ঢেউ সেলাই এসব শব্দ ব্যবহার করতো। ওইসব নামগুলি মনে হয় অনেকটা আধুনিক কালের। আর কাঁথা শিল্প সুপ্রাচীন। সেই চৈতন্য জীবনী কাব্য থেকে (কৃষ্ণ দাস কবিরাজ মহাশয়ের শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে) কাঁথার কথা শোনা যায়। আবার জসিম উদ্দিন 'নকশী কাঁথার মাঠ' লিখে চিরন্তন সাহিত্যের আসন লাভ করেছেন। সে যাই হোক, আগের দিনের গ্রামের মেয়েরা সেলাইয়ে দক্ষ কোন মেয়ের কাছে গিয়ে এই ফোঁড় তোলার কৌশল শিখে নিতো। তারপর নিজে নিজেই বাড়িতে বসে ওই ফোঁড়ে কাঁথা সেলাই করতো।

আগের দিনের মেয়েরা নকশি কাঁথা পাড়ার সময় গ্রামের কোন মহিলার কাছ থেকে কাঁথার উপর নকশা এঁকে নিতো। এই নকশা মূলত চতুর্ভুজ, গোলাকার, ত্রিভুজাকার, লতাপাতা, ফুল, পাখি ইত্যাদি হয়ে থাকতো। পদ্মফুলের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সেইসঙ্গে চন্দ্র, সূর্য মাছ প্রভৃতিরও। আবার ধর্মীয় ভাবনা, রূপকথা, বাড়ির আশেপাশে দেখা গাছ, লতাপাতা এই নকশি কাঁথায় স্থান করে নিত।

বর্তমান সময়ে কাঁথা একটি পণ্য। দেশে-বিদেশে এর বহুল চাহিদা। এখন শহুরে মানুষ, বিদেশী সাহেবরা নকশীদার কাঁথার খুব ভক্ত। অবশ্য এইসব কাঁথা সেইসব প্রাচীন নিরক্ষর মহিলাদের তৈরি নয়। এখন সমবায় ভিত্তিক বা কোথাও নারী সমিতি দ্বারা প্রশিক্ষণ নিয়ে এই কাঁথা তৈরি হচ্ছে। এইসব কাঁথার অধিকাংশই তৈরি হচ্ছে মেশিনে। মেশিন চালিয়ে সুন্দর কাপড়ে সেলাই করে তৈরি হচ্ছে কাঁথা। বেশ কিছু কাঁথা হাতেও সেলাই হচ্ছে। সুন্দর সুন্দর নকশা তুলছে। তবে এখনকার দিনের এই কাঁথা আর আগের দিনের মেয়েদের তৈরি কাঁথার মধ্যে ভাবনা গত অনেক ফারাক আছে। আগের দিনের কাঁথা ছিল কৃত্রিমতা হীন। সহজ সুরে, জীবনের সুরে ভরপুর। সে কাঁথায় খুঁজে পাওয়া যেত সোঁদা

কতদিন দেখেছি কাঁথায় ভাদ্রের রোদে দিতে গিয়ে মা স্মৃতির ডালা খুলে বসত। সুন্দর সাদা শাড়ির সুজনি কাঁথায় হাত বুলাতে বুলাতে মা বলতো এই কাঁথাটা আমার মায়ের হাতের তৈরি। এই শাড়িটা মায়ের ছিল। মা অল্প কয়েকদিন শাড়িটা পরে ছিল। তারপরে এই কাঁথাতে লাগানো হয়। মা কবেই মারা গেছে। এখনো এই কাঁথার গায়ে মায়ের গায়ের গন্ধ যেন লেগে আছে। কাঁথায় হাত বুলালে মনে হয় যেন মায়ের গায়ে হাত বুলাচ্ছি।

মাটির গন্ধ। সরল জীবনের সহজ ভাবনা। আর আধুনিক কাঁথাশিল্প কৃত্রিমতায় ভরা। এখানে কৃত্রিম ভাবনা, মাপা শিল্পকর্ম, সচেতন মনের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের মন ভুলানোর ভাবনা কাজ করে। খরিদ্দারের কথা মাথায় রাখা হয়। তাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে পণ্য হিসাবে কাঁথা তৈরি হয়।

গ্রাম জীবনের সেই সহজ সরল অকৃত্রিম ভাবনার ছাপ এখনকার কাঁথায় পাওয়া যায় না। শীতের মেদুর দুপুরে পা মেলে বসে পায়ের উপর কাঁথা চাপিয়ে গল্প করতে করতে কাঁথা সেলাই করার সেই দৃশ্য এখন আর গ্রাম ঘরে দেখাই যায় না। বাবুই পাখির বাসার মতো হারিয়ে গেছে সে সব। অতীতের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আছে। গ্রামীণ শিল্পচর্চার নামে কৃত্রিম মেকি শিল্প চর্চায় মানুষ ব্যস্ত।

আগের দিনে ভাদ্র মাস আসলে, প্রখর রোদ ভরা দিনে বাক্স পেট্রা থেকে রাশি রাশি কাঁথা বের করে রোদে দেওয়া হতো। সারাদিন ধরে রোদ শুষে কাঁথাগুলি টান টান হয়ে উঠত। এতে করে পোকায় কাটার ভয় থাকত না। তারপর ন্যাপথলিন, কালো জিরে ইত্যাদি দিয়ে আবার পরম যত্নে ভরে রাখা হতো। যেন বিরাট সম্পদ কিছু। সম্পদই তো। অনেক পরিশ্রমের জিনিস, প্রয়োজনের জিনিস। সম্মান রক্ষার জিনিস। দু চার খানা ভালো কাঁথা ঘরে না থাকলে আপদে-বিপদে কত যে বেকায়দায় পড়তে হয় তা যাদের না থাকতো তারাই বুঝত। অবশ্য গ্রাম ঘরে কাঁথা না থাকা মানুষের সংখ্যা খুব একটা ছিল না বললেই চলে। খেয়ে না খেয়ে মানুষ অন্তত গোটা কয়েক এই পরম সম্পদ তৈরি করে অতি যত্নে তুলে রাখতো।

কতদিন দেখেছি কাঁথায় ভাদ্রের রোদে দিতে গিয়ে মা স্মৃতির ডালা খুলে বসত। সুন্দর সাদা শাড়ির সুজনি কাঁথায় হাত বুলাতে বুলাতে মা বলতো এই কাঁথাটা আমার মায়ের হাতের তৈরি। এই শাড়িটা মায়ের ছিল। মা অল্প কয়েকদিন শাড়িটা পরে ছিল। তারপরে এই কাঁথাতে লাগানো হয়। মা কবেই মারা গেছে। এখনো এই কাঁথার গায়ে মায়ের গায়ের গন্ধ যেন লেগে আছে। কাঁথায় হাত বুলালে মনে হয় যেন মায়ের গায়ে হাত বুলাচ্ছি।

আমার মা যেন কেমন স্মৃতি কাতর হয়ে পড়তো। নানিমার গায়ের গন্ধ মাখা সেই কাঁথাটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতো। কখনো টপটপ করে চোখ থেকে পানি ঝরতো। এই কাঁথা যিনি তৈরি করেছেন সেই মানুষ আজ আর পৃথিবীতে নাই। কবেই মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন। কত পুরনো সেই দিনের কথা আজও মায়ের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সুদূর অতীতের গর্ভ থেকে নানীমার গায়ের গন্ধ, স্পর্শ যেন এই কাঁথা এই ভাদ্রের দুপুরে বয়ে আনত মায়ের কাছে।

গ্রাম জীবনে এখন মানুষের ঘরে ঘরে এই স্মৃতির সম্পদ কমে আসছে। অনেকের বাড়িতে আজ দু চার খানা কাঁথা ছাড়া সবই তুলোর লেপ তোষক। ছেলে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে, শ্বশুরবাড়ি বিভিন্ন জিনিসপত্র পাঠাতে হচ্ছে, তার সবই দোকান থেকে কেনা লেপতোষক বা বিভিন্ন কোম্পানির ম্যাট্রেস। এখন আর হাতের তৈরি মায়ের ছোঁয়া মাখা জিনিস তেমন কেউ পাঠাচ্ছে না। এখন কোন কোন বাড়িতে কয়েকখানা কাঁথা থাকলেও তা ট্রাঙ্কে বন্দী হয়ে বছরের পর বছর পড়ে থাকে। ভাদ্রের রোদের মুখ দেখতে পায় না। কিংবা ঘরের ঢালাই এর উপর বস্তায় পুরা থাকে। ইঁদুরের বাসা হয়।

এখনো আমি গ্রামে ঘুরি। সেই সব শিল্পীর হাত খুঁজি। গ্রামের পূব পাড়ায় গেলে মাজেদার কথা খুব মনে পড়ে। অসুস্থ স্বামী আর দুটি ছেলে একটি মেয়ে নিয়ে তার সংসার। ছোটবেলায় দেখতাম তার উঠনে পেয়ারা তলায় বসে পায়ের উপর কাঁথা টেনে নিয়ে নিমগ্ন চিত্তে সেলাই করে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ তার কাছে কাঁথা সেলাই করতে দিত। স্বামী অসুস্থ, তাই সংসার চালানোর ভার তার কাঁধে। কাঁথা সেলাই করে যে দু পয়সা উপার্জন হত তা দিয়ে সংসারের কিছুটা সুরাহা হত। হাতের কাজও ছিল চমৎকার। কত রকম সেলাই জানতো সে। কত রকমের কাঁথা যে তার হাত থেকে বের হত তার হিসাব নাই। অনেকদিন হলো মাজেদা মারা গেছে। এখন আর সেই পেয়ারা তলাও নাই। চালা ঘর ভেঙে সেখানে উঠেছে পাকা বাড়ি। ছেলেরা সুখেই আছে। কিন্তু শিল্প চিরতরে হারিয়ে গেছে। সারা দিগর খুঁজলেও মাজেদার মত একটা মানুষ খুঁজে পাই না। যারা হাত থেকে বেরোবে সুজনি, নকশীর মতো হাজারো কাঁথা।

শুধু কাঁথা শিল্পেই নয় সূচি শিল্পের আরো অনেক চিরন্তন নমুনা দেখা যেত রুমাল, টেবিল ক্লথ, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতিতে। এসব কাপড়ের উপর কোন একজনকে দিয়ে একটা নকশা আঁকিয়ে নিয়ে তা সুচ সুতোয় ভরাট করে তুলত। আর এ কাজে লাগতো অসীম নিষ্ঠা ও ধৈর্য। ভালোবাসার মানুষকে রুমাল উপহার দেওয়ার সময় আন্তরিক ভালবাসা মিশিয়ে হৃদয়টা যেন সুতোই বেঁধে অর্পণ করতো। আবার প্রিয় মানুষটা যে বালিশ মাথায় দেবে তাতেও থাকতো ভালোবাসার ছোঁয়া। হাতের স্পর্শ।

অনেকের ঘরে দেখেছি দেওয়ালে কাচের ফ্রেমে কাপড়ের উপর লেখা কবিতার লাইন। রঙ্গিন সূতোয় কবিতার লাইনকে ফুটিয়ে তোলা। কখনো বা দেখেছি দুটি টিয়া পাখি মুখোমুখি বসে। মাঝে একটি ফুল। ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক বসে থাকতো ঘরের দেওয়ালে। টিয়া পাখির শরীর গড়ে উঠতো সবুজ সুতোই আর ঠোঁট দুটো লাল সুতোয়। মাঝের ফুলটিও অধিকাংশ বাড়িতেই দেখতাম লাল সুতোয় বুনিয়ে তোলা। বেশিরভাগ ছবির

চারপাশ ঘিরে থাকতো লতানো ফুল, পাতা। আবার কোনো ছবির এক কোণ থেকে উড়ে আসছে প্রজাপতি। কিংবা গোটা ক্যানভাস জুড়েই থাকতো একটা রঙিন প্রজাপতি। সাধারণত এই ধরনের ছবি বা লেখার ক্ষেত্রে হলুদ লাল আর সবুজ সুতোর ব্যবহার ছিল বেশি। মামাদের বার বাড়ির মাটির ঘরের দেয়ালে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো একটি কবিতার লাইন লেখা ছিল। যখন আমি সবেমাত্র পড়তে শিখি তখন বানান করে করে পড়তাম। তারপরেও অনেক দিন সেই লেখা গড়গড় করে রিডিং পড়েছি—'এদিন চলিয়া যাবে/ক্ষণ কাল পরে। রবে মাত্র কর্মফল/চিরদিন তরে।' একটা বাড়িতে দেখেছিলাম কতগুলো হাদিস এমনভাবে কাপড়ের উপর সুতোয় করে লেখা—পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ, নামাজ জান্নাতের চাবি।

এসব যারা সূচিশিল্পে ফুটিয়ে তুলত তারা সবাই পড়াশোনা জানতো এমন নয়। অনেক নিরক্ষর মেয়েকেও দেখেছি এমন লেখা কাচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখতে। লেখাপড়া জানা কারো সাথে কাপড়ের উপর লেখাটা লিখে নিয়ে তার উপর সূচ সুতোয় কাজ করে তাকে চিরন্তন শিল্পের মর্যাদা দিত। সেই লেখাকে অনন্তকালের নৌকায় ভাসিয়ে দিত। সে সব মানুষ হয়তো পৃথিবী থেকে চলে যেত তাদের হাতের কাজ, অমর বাণীগুলো থেকে যেতো ঘরের দেওয়ালে। এখন আর ঘরের দেওয়ালে এমন হাতের কাজ দেখা যায় না। এখন দোকান থেকে কেনা নানা সৌখিন শোপিসে ঘরকে সাজিয়ে তোলা হয়।

সুচি শিল্পের সাথে সাথে কালের গর্ভে আরো যে কত গ্রামীণ শিল্পকলা বিলীন হয়েছে তার হিসেব নাই। সে সব মানুষেরা সচেতন ভাবে শিল্প করছে বলে হয়তো সে কাজগুলো করত না। অনেকটাই রুটি রোজগারের তাগিদে করত। তবে কাজগুলোর মধ্যে কোন ফাঁকি থাকতো না। গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজটিকে আরো কত ভালো করা যায় সেই ভাবনা নিয়েই তারা কাজ করত। বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, খড় দিয়ে ঘর ছাওয়া সব কি নিপুণ হাতে তারা করে চলত। এক একজন মানুষের পাঁচ গ্রাম জুড়ে নাম থাকতো। তাকে দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নিতে চাইতো মানুষ। যেমন ঘরামির কাজ। আমাদের এলাকায় রহিম ঘরামি ছিল খুব প্রসিদ্ধ। মানুষ তাকে দিয়েই ঘর ছাওয়া কাজ করিয়ে নিতো। অন্য ঘরামির উপর আস্থা কম। কারণ রহিম ঘরামি ঘর ছেয়ে গেলে কয়েক বছর নিশ্চিত। জল পড়ার ভয় থাকত না। আবার লাঙল বাঁধার দক্ষ মিস্ত্রি ছিল ফরু। তার হাত থেকে বেরুত অসাধারণ সব ফসল ফলানো যন্ত্র। পাঁচ গাঁয়ের মানুষ ভিড় করে তার কাছ থেকে লাঙল বেঁধে নিয়ে যেত। তার বাঁধা লাঙল বেয়ে নাকি দারুন সুখ । এখন মাঠে জুড়ে দাপিয়ে বেড়ায় ট্রাক্টর। ফলে ফরু মিস্ত্রির দিন গেছে। এখন তার কারখানা পড়ে পড়ে কাঁদে।

এভাবে গ্রামীন শিল্পকলা একে একে বিলুপ্তির পথে। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতা ক্রমশ গ্রাস করে ফেলছে সমস্ত ধরনের গ্রামীণ হস্তশিল্প কলা। আগের দিনের মানুষ হাতের তৈরি জিনিস বানিয়ে রাখত মেলা খেলায় বিক্রি করার জন্য। এখন মেলা বসে তবে মানুষের হাতের তৈরি জিনিস বিক্রি হয় না। কারখানায় তৈরি প্লাস্টিকের খেলনা মেলা প্রাঙ্গণ দখল করে থাকে। ফলে পুরনো আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে এখন। চারিদিকে এখন শুধু ভাঙ্গনের শব্দ।

বইচর্চা

ফজলুল হক-এর ‘ছায়ানিলয়’ : পাঠ প্রতিক্রিয়া

ছায়ানিলয় সেই উপন্যাস জীবনের ধ্বস্ত বাস্তবতাকে ততোধিক ধ্বস্তরূপে উপস্থাপন করা যেখানে ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য নয়। জীবনে আলো আছে, অন্ধকার আছে, আছে আলো-অন্ধকারময় সমন্বিত সত্যের উচ্চকিত উচ্চারণ। সবমিলিয়ে বৈচিত্র্যময় এই মানবজীবন, যা প্রসারতায় অসীমান্তিক ও গভীরতায় অতলস্পর্শী প্রায়। এমন বিরাট যে জীবন তাকে শিল্পের সীমাবদ্ধ আধারে ধারণ ও লালন করা মোটের উপর অসম্ভব। শিল্পী-সাহিত্যিক মাত্রই তাই তাদের মতো করে একটা সিদ্ধান্ত নেন এবং ওই সিদ্ধান্তের অনুসারী করে বিস্তার করেন তাঁদের পরিকল্পনার জাল। ছায়ানিলয়ে-ও তার ব্যতিক্রম নেই।

চাঁদনিহারা-মিহিলাল-মলি তিনজন নরনারীর সম্পর্কের ঘাত প্রতিঘাতের বর্ণময় সমীকরণ এ উপন্যাস। স্কুল জীবনে সহপাঠী মিহিলালকে ভালোবেসেছিল মলি; এদিকে মিহিলালের মনের অঙ্গনকে রঞ্জিত করেছিল চাঁদনিহারা তার ভালোবাসার রঙে। সবমিলিয়ে বেশ একটু জটিলতা তৈরি হয়েছিল। এই জটিলতার গ্রন্থিমোচন হতে না হতে তাদের জীবন-সমুদ্রে প্রবল ঝড় উঠলো সামাজিক বাস্তবতার দুরন্ত অভিঘাতে। বামপন্থী আন্দোলন তখন সমাজজীবনকে সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত করছে। সে আলোড়নে প্রকম্পিত হল এতদিনের লালিত জীবনবোধের ভিত্তি। বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধি মিহিলাল আন্তরিকতার দিগন্ত বরাবর নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েও প্রলেতারিয়েত কন্যা চাঁদনিহারাকে তার ঘরণী করতে পারলো না। চাঁদনিহারা অঙ্কশায়িনী হতে বাধ্য হল তার শ্রেণিপ্রতিনিধি, পার্টিকর্মি লালনের। এদিকে ফুফাতো বোন হীরার হাতে হাত রেখে দাম্পত্য হাড়িকাঠে বলি প্রদত্ত হতে হল মিহিলালকে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে মলি প্রাণপণে সচেষ্ট হল তার প্রেমের প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে।

ঘটনার ভিড় রয়েছে উপন্যাসের অঙ্গনে, তবে তা কখনোই ঘনঘটায় পরিণত হয়নি। চরিত্রের মানসিক ক্রিয়াশীলতাই শেষাবধি প্রাধান্য পেয়েছে। একান্ত এক মিলনের রাতে মিহিলালের থেকে প্রাপ্ত হওয়া ভালোবাসা স্মারক অন্তরকে চোখের জলে ধৌত করে শেষ

শয্যা নিয়েছে কর্কট রোগাক্রান্ত চাঁদনিহারা। এদিকে অবৈধ-পুত্র অন্তরের হাতে হাত রেখে প্রিয়তমার কবরে দু মোঠো মাটি নিবেদন করেছে মিহিলাল। দূর থেকে এই দৃশ্য উপভোগ করে পরিতৃপ্তির অনলে সিক্ত হয়েছে মলি।

মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বেশ একটু নাটকীয়তার রঙ লাগানো হয়েছে কাহিনির শরীরে। কিন্তু স্বরূপত তা নয়। অন্তত ঔপন্যাসিক তেমন কোনো সিদ্ধান্তের সাপেক্ষে প্রাণিত হননি তা জোর দিয়েই বলা যায়। একদিকে মুসলমান সমাজে পারিবারিক জীবনের দূষিত বাস্তবতা যা মিহিলালকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফুফাতো বোন হীরাকে বিয়ে করতে বাধ্য করে এবং অনিবার্যভাবে ক্লেদাক্ত হয়েছে তাদের দাম্পত্য তার বিপরীতে রাজনৈতিক বাস্তবতার নগ্নরূপের ভাষ্য প্রণয়ন উপন্যাসের মূল উপজীব্য।

বাস্তবের বাস্তবতাকে শৈল্পিক বাস্তবতায় রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে ঔপন্যাসিকের ক্রিয়াশীলতা আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে এই ক্রিয়াশীলতার ফসল শেষাবধি কতটা ফলেছে তা নিয়ে কিছুটা সংশেয়ের অবকাশ রয়েছে। মলি আদ্যন্ত আদর্শায়িত। তার এমন নির্মিতি আমাদের সামাজিক-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক সম্পর্কে সম্পৃক্ত। তবে ঔপন্যাসিকের দিক থেকেও যে এক্ষেত্রে কিছু বলার থাকতে পারে না তা অবশ্যই নয়। পাঠকের সামাজিক অভিজ্ঞতার অনুসারী হওয়ার দায়কে একজন শিল্প-স্রষ্টা যদি অস্বীকার করতে চান তবে ন্যায়ত পাঠকের দিক থেকে কিছু বলার নেই; পাঠক বড় জোর প্রত্যাখ্যান করতে পারেন এই সৃষ্টিকর্মকে।

এখন প্রশ্ন, স্রষ্টার স্বাধীনতা ও পাঠকের গ্রহণ, বর্জনের অধিকার, এই দুই এর সাপেক্ষে কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ তা হলে কী হবে। এমন জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে স্মরণ করা যেতে পারে কথাকার শরৎচন্দ্রকে। একটা সময় ছিল যখন বাংলা কথাসাহিত্যক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন প্রায় শেষকথা। কিন্তু এখন অনেকেই অনেক বাঁকা কথার সুর ভাজেন তাঁকে কেন্দ্র করে। এইসব বাঁকা কথার মধ্যে কিছু সার কথা যে নেই তা অবশ্যই নয়; আবার সেসব বাঁকাকথার স্রোতাঘাতে ভেসে যায় না শরৎসাহিত্য। অর্থাৎ নিজস্ব ক্ষেত্রে এর অনন্যতা অনস্বীকার্য। যতদূর মনে হচ্ছে, এক্ষেত্রে শরৎ সাহিত্যাদর্শের অনুগামী ঔপন্যাসিক।

নিবিড় রোমান্টিকতার বাঁধনে বাঁধা হয়েছে উপন্যাসের আখ্যান এবং তার উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত ভালোলাগার রঙ। হতে পারে মলি ঔপন্যাসিকের মানসকন্যা। মুসলমান সমাজের খোলা বারান্দা দিয়ে মেয়েদের স্বাধিকারের বাতাস আজও সেভাবে প্রবাহিত হতে পারে না। এই জায়মান বাস্তবতার বিপরীতে মলিকে রচনা করা হয়েছে। মলির আব্বা মা প্রথামবধি মেয়েকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। কোনোরকম প্রতিবন্ধকতার বেড়া রচনা করেননি তারা। মলি তাদের বিশ্বাস ও স্বপ্নের ফসল ফলিয়েছে তার ব্যক্তি জীবনে। কোনো মলিনতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। খুবসম্ভব মলির নির্মাণে লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা তাঁর শিল্পীমনের গতিরোধ করেছে। এতে স্থানে স্থানে কিছুটা ছন্দপতন হয়েছে। মিহিলাল-মলির সম্পর্ক যতটা আদর্শিক ততটা মানবিক সম্পর্কের রঙে রক্তাক্ত নয়।

সাইফুল্লা

বইচর্চা

কবি কাজী কল্পনা ইসলামের জীবন ও সাহিত্য

এটি মূলত একটি স্মারকগ্রন্থ সাহিত্যিক কাজী কল্পনা ইসলামকে নিয়ে। সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন কবি হিসেবে মুর্শিদাবাদ জেলার মফঃস্বল শহর জঙ্গীপুরের খুব পরিচিত দৃঢ়চেতা মহিলার মুখ কাজী কল্পনা ইসলাম। বর্ধমান কেতুগ্রামের শিক্ষিত রক্ষণশীল মুসলিম সুফী ঘরাণার মেয়ে হয়েও সাহিত্য চর্চায় তাঁর ছিল সাহসী পদক্ষেপ। সাহিত্যপ্রীতির কথা জানা যায় বিয়ের আগে থেকেই। কাজী কল্পনার দাদু হাজী আবদুর রব ছিলেন কেতুগ্রাম স্যার আশুতোষ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন হাই স্কুলের সেকেন্ড স্যার। মুক্তমনা সাহিত্যিক কাজী আমিনুল ইসলামের সঙ্গে বিয়ের পর জঙ্গীপুরে স্বামীর সাহচর্যে এসে পরিপূর্ণতা পায় সাহিত্যচর্চা এবং তা স্থায়িত্ব পায় আমৃত্যু।

কাজী কল্পনার নিরন্তর বিচরণ দেখা যায় মূলত কবিতার জগতে; কবিতার অনুভবের মধ্যে নিজেকে উজাড় করে দিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কাজী কল্পনা ইসলামের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে প্রকাশকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন : 'লেখক মাত্রই সমাজ জীবনের প্রদর্শক। কাজী কল্পনা ইসলাম সাহিত্যের পথে দীর্ঘ হেঁটেছেন। সহজ সরল ভাষায় সম্প্রীতির সমাজ, সমাজ সচেতন মুক্ত মনের মানুষ গড়ার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতি ও মানবতার তরঙ্গ তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে ভেসে রয়েছে।' শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় কবি ছিলেন সত্যিকারের একজন মানুষ গড়ার কারিগর; কবিতার অনুসঙ্গ হিসেবে স্বভাবতই এসেছে, জাতির মেরুদণ্ড

তৈরির কথা। অকপটে বলেন—'জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষার সাথে সাথে।' সেবাই মানুষের ধর্ম- 'বড় হবে একদিন-/সেবা দায় বদ্ধতা ব্রত করে/ মানুষের মাঝে ঢুকে/ খুঁজে নেবে মনের কথা/ জ্যোতির্ময় আলোক সম্পাতে/স্বর্ণজ্যোতির ছটায় ভরে উঠবে/সোঁদা গন্ধ ভরা মাটির বুক।' প্রকৃতি প্রেমী কবি অবসরে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন বাড়ির আপন তৈরি বাগানে ; যার প্রতিবিম্বন রয়েছে কিবতায়---'বার বার দেখতে ইচ্ছে করে/আকাশকে-/দিগন্ত বিস্তৃত নীলিমা/হাওয়ায় দোলা নক্ষত্র/কক্ষচ্যুত হয় মাঝে মাঝে/তারা আসা তারা নামা'। পাহাড় পর্বতের কথা এসেছে কবিতায়—'বর্ণালী/ পর্বত-অরণ্যে অন্তঃকরণ টান/বাহু বেষ্টনীর নিবিড় আলিঙ্গন/ আটক করে-ধরে রাখার অভিপ্রায়'।

এ রকম আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অজস্র বিষয় ধরা দিয়েছে বার বার কবি কাজী কল্পনা'র কবিতায়; যার কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবের জগতে মুগ্ধ না হয়ে পারেননি পাঠক। নিজ রাজ্য ছাড়াও ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর অজস্র বিভিন্ন ধরণের লেখা, বিশেষত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে; যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সঙ্গে, পুরস্কৃত হয়েছেন কয়েকবার। সাহিত্যানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলে ছুটে যেতেন সাহিত্যিক দম্পতি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। যোগ দিয়েছিলেন নিউ দিল্লির কালী বাড়ি মন্দির মার্গে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে। লেখিকার সাহিত্য সাথী ও প্রেরণাদাতা ছিলেন স্বামী কাজী আমিনুল ইসলাম। কবির প্রকাশিত চারটি কাব্যগ্রন্থ—ফিরে পাই তোমাকে, এসো মানুষ এসো তোমরা, একটি সবুজ হৃদয়, দীপ জ্বেলে দেব।

শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ; পাঠকের হৃদয়ে দীপ জ্বেলে রেখেই কবি কাজী কল্পনা ইসলাম চির বিদায় নিয়েছেন আমাদের থেকে। পঞ্চম কাব্য গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তুতির সময়েই অমোঘ মৃত্যু তছনছ করে দেয় সব। কবি কাজী কল্পনার মৃত্যুর পর 'বহ্নিশিখা পত্রিকায়' লেখা হয় : 'আত্মপ্রচার বিমুখ অত্যন্ত সুগৃহিণী কাজী কল্পনা ইসলাম সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। মিশতেন একেবারে শোষিত নিপীড়িত শ্রেণীর মহিলাদের সঙ্গে। সাহিত্য নিয়ে তাঁর বিনোদন নয়, বিনোদন শোষিত নিপীড়িতদের জাগরণে।' সাহিত্যিক স্বামী কাজী আমিনুল ইসলামের কাছে জানা যায় কাজী কল্পনার অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত অজস্র কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। সব লেখাগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করে; এই গুণী বিরল মহিলা সাহিত্যিকের কষ্টার্জিত অমূল্য সাহিত্য সম্পদ সম্পূর্ণ ভাবে তুলে ধরে সাহিত্য পিপাসুদের ধন্য করবেন—এই প্রত্যাশা রইলো আগামীতে। জগতের নানা দায়িত্ব থেকে মুক্তির বার্তা পেয়ে কবি চিরদিনের জন্য চলে গেছেন ঠিকই; রেখে গেছেন তাঁর অমূল্য সৃষ্টিশীল সম্পদ। চির অম্লান থাকবে তাঁর এই কাজ। 'আমার স্বপ্ন আমার আকাশ/সেখান থেকে সবুজ পৃথিবী/হলুদ আলোয় লাল ফুল/নরম ঘাসের বিছানা পেত/সুখ নিদ্রার আশ্বাস এক সাথে।'

কাজী কল্পনা ইসলামের মৃত্যু হয় ৬৮ বছর বয়সে ২০১৮ সালে; মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও কবিতার মধ্য দিয়েই ছুটি নিয়েছেন চিরদিনের জন্য এই ধরাধাম থেকে :

‘ ভালবেসেছিলাম তোমার দুটি চোখকে/যার মাঝে ছিল সাগরের গভীরতা/পাহাড়ের গাম্ভীর্য।/দিগন্তহীন আকাশ ছুঁয়ে সে/বারবার আসত আমার কাছে।’ কাজী আমিনুল ইসলাম মুর্শিদাবাদের একজন সুপরিচিত সাহিত্যিক; নিজে আড়ালে থেকে সাহিত্য চর্চায় রত আছেন এ পর্যন্ত। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন নিজে ; ২৪ সেপ্টেম্বর স্ত্রীর মৃত্যু দিনে স্মরণ করেছেন নিজের লেখা কবিতা দিয়েই, মুখবন্ধে লিখেছেন: ‘চলে গেলেন,/অনন্ত অসীমে।/ অর্পণ হল অনন্তের অতিথি/সারি সারি জানাজায়/প্রিয়া প্রীতিময়।/তিন মুঠি মাটি/হাত তুলে মোনাজাত/অনন্ত জীবনের/অশেষ সুখের কামনা।’

কবি কাজী কল্পনা ইসলামের পেশা ছিল শিক্ষকতা। সাহিত্য চর্চা ও তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানার জন্য স্মারক গ্রন্থটি যে খুবই সহায়ক তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা কোনদিনই ব্যক্তি কাজী কল্পনা ইসলাম ও তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত হননি সম্যকভাবে। এই গ্রন্থ পাঠে সামগ্রিক ভাবে কবি ও কর্তব্য নিষ্ঠ মানুষ কাজী কল্পনা সম্পর্কে একটি সঠিক ও সামগ্রিক ধারণার উপলব্ধি ঘটবে তাঁদেরও, এ কথা বলা যায় হলফ করে। ব্যক্তিগত জীবনে কবি যেমন ছিলেন একজন সফল গৃহিণী, শিক্ষিকা ও কবি, অপর দিকে ছিলেন খুবই অতিথি পরায়ণ; অনেকের কলমের বর্ণনায় এ কথকতার সত্যতা পরিস্ফূট হয়েছে বার বার। পরিচ্ছদ দুই-য়ে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের গুণীজন থেকে সাহিত্যসাথীরা তাঁদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন গ্রন্থটিকে। উল্লেখ্য প্রায় ৩৭ জন গুনী ও সাহিত্য সাথী বিভিন্ন কোণ থেকে, অত্যন্ত কাছ থেকে দেখা কাজী কল্পনা ইসলামের মুল্যায়ন করেছেন স্পষ্টতার সঙ্গে। এই পরিচ্ছদ কাজী কল্পনার সাহিত্য সাধনা থেকে তাঁর সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় পাঠককে। গ্রন্থের এই অংশ সমৃদ্ধ ও বিমুগ্ধ করে পাঠকে।

স্মারকটির সম্পূর্ণতা পেয়েছে কাজী কল্পনা ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনী, কবির একগুচ্ছ কবিতা ও বিভিন্ন সময়ে লেখা ডায়েরির পাতা সংযুক্ত হওয়ায়। তাঁর ডায়েরির পাতাগুলির সংযোজন এই গ্রন্থের একটি অমূল্য সম্পদ; কবির ব্যক্তি, পেশা ও সাহিত্য জীবনের অনেক কিছুই ধরা আছে এখানে। সাহিত্যিকের সৃষ্টি নিয়ে কি যে আকুতি সে সব দেখা যায় তাঁর ডায়েরিতে, লিখছেন—‘কবিতা লেখার কথা আজ সারাদিন আমাকে ভাবিয়েছে। লেখা কেন যে এগোচ্ছে না দুঃখ লাগছে। এক একটি কবিতা আমার জীবনের এক একটি সম্পদ। আমার সম্পদ আমি যেন কোনদিন হারিয়ে না ফেলি। কবিতা আমার হৃদয়- মন- প্রাণ- ধন- সম্পদ- সন্তান।’

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের, ঐতিহাসিক জায়গা স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা ও ভালোলাগা অনেকটা মূর্ত হয়েছে ডায়েরি পাতায় পাতায়। মুখবন্ধে সম্পাদক কাজী কল্পনা-র লেখা ডায়েরী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে—তাঁর ডায়েরী দীর্ঘদিনের দীর্ঘপরিধি। ঘটনা, তার উপলব্ধি, সাহিত্য অনুষ্ঠানও, তাতে রয়েছে। তাঁর ডায়েরীর নাম - তাঁরই দেওয়া - ‘মনে পড়ে/আজ কাল পরশু,/ মনে পড়া দিনগুলি।’ ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে মা’কে নিয়ে কবি স্বামীর সঙ্গে পবিত্র হজ্ব পালন করেন, সে সবের বর্ণনা রেখেছেন সযত্নে

ডায়েরিতে। কলকাতার হজ্ব হাউসে বসেও লিখেছেন কবিতা, তার উল্লেখ পাই আমরা তাঁর লেখা ডায়েরির পাতায়—'পবিত্র কাবা/আজকে আমরা/বের হবো তোমার পথে,/ বুকে তুলে নেবে/ভালবাসা দেবে।/মাফ করে সব পাপ,/ স্নেহের করুণা দিয়ে/ মুছিবে সব গ্লানি /নতুন জীবন দান/করে তুমি পথে/দেখাবে আলোর/জ্যোতি শুধু/ এই মনোরথে।' সুদুর মক্কাও মদীনায় ইবাদতের অবসর সময়ের ফাঁকে ভরেছেন ডায়েরির পাতা কবিতায় ও দেখার বিভিন্ন অনুভবে। কবি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন সুদূর মদিনায় বসে , লিখেছেন : 'এই মহামিলন কেন্দ্র। এখানে সারা বিশ্বের সমবেত ধর্মপ্রাণ মুসলিম। মেয়েদের পর্দার সাথে মসজিদে প্রবেশের অধিকার। কালো, ধলো নানা রঙের লোক।

কত দেশের কত ধরনের মানুষ। বিশেষ করে মেয়েরা। সবাই আল্লাহর মেহমান সবাই সবার দিকে তাকাচ্ছি - মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করছি-কেউ কারও ভাষা বুঝছি না। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুর্কিস্তান, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, স্পেন- এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা বিশ্বের মানুষের সমাগম। নামাজ এবং পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা বিনিময় মোসাবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানব যেন তৃপ্ত। সবার পরিচ্ছন্নতা-মন আপ্লুত।' মুর্শিদাবাদের এই মহিলার একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে হয়তো অনেকেরই সম্যক ধারণা না থাকতে পারে; তেমন হলে এই গ্রন্থ তাঁদের জন্য বিশেষ সহায়ক হবে।

গ্রন্থের আর এক সম্পদ প্রায় ৫৮/৫৯ খানা ফটোগ্রাফ ; গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ভারতের ভূতপূর্ব রাস্ট্রপতির সঙ্গে দিল্লিতে কবি দম্পতির একটি মূল্যবান ছবি। এ ছাড়াও শিলচর, ভুটান, রাঁচি, ব্যাঙ্গালোরে টিপু সুলতানের প্রাসাদ, শিলং -এ কাঁচের মসজিদের ছবি , গৌহাটিতে কামাখ্যা মন্দিরে বেড়ানো সহ আরও অনেক ছবি সংযোজিত হয়েছে এই গ্রনে।

ঝকঝকে সুন্দর ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভালো। লেখা অবস্থায় কবির একটি সুন্দর ফটোগ্রাফ প্রচ্ছদ তৈরিতে ব্যবহার করেছেন প্রণব হাজরা ; একটি ভালো মানের প্রচ্ছদ। গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার কাম্য।

—আলিমুজ্জমান

কবি কাজী কল্পনা ইসলামের জীবন ও সাহিত্য—কাজী আমিনুল ইসলাম (সম্পা.), চায়না পাবলিকেশন, ২৫০ টাকা

বইচর্চা

রুকসানা : অন্য এক প্রতীতির লক্ষ্যে পথচলা

দুর্গাপুরের কবি আশরাফুল মণ্ডলের প্রথম উপন্যাস 'রুকসানা' (জানুয়ারি,২০২২)। ৪২ পরিচ্ছেদের ১৪৪ পৃষ্ঠার অনতিদীর্ঘ উপন্যাস। বিশ্বভারতীর কৃতি ছাত্র আশরাফুল প্রায় তিন দশক ধরে কবিতা লিখছেন, কবি হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। দু' দশকের বেশি সময় ধরে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম আছে তাঁর। 'রুকসানা' উপন্যাসে কবির সংবেদনাটুকু মুখ্য হলেও রচনার পিছনে কবিকে সরিয়ে শিক্ষকের আদ্যন্ত সমুজ্জ্বল উপস্থিতি বর্তমান। 'রুকসানা' একটি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। নামেই প্রকাশ, এটি একটি নারী চরিত্র কেন্দ্রিক রচনা। সে নারী আবার এক নিম্নবিত্ত গ্রামীণ মুসলমান পরিবার থেকে উঠে আসা। পরিবার, সমাজ, প্রথা ধর্মের অনুশাসন, পারিপার্শ্বিকের প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সে কেবল প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হয়েছে একালের দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করা সংগ্রামী মেয়েদের দৃষ্টান্ত।

আশরাফুল মণ্ডল বর্তমানে দুর্গাপুরের বাসিন্দা হলেও তিনি বাঁকুড়ার সোনামুখির একটি কৃষক পরিবারের সন্তান। শিকড়ের সঙ্গে এখনো তাঁর নিবিড় যোগ। এই উপন্যাসের পশ্চাৎপটে রয়েছে তাঁর হাতের তালুতে চেনা সেই গ্রামীণ পটভূমি। এক বিপরীত পরিবেশে একটি ছাত্রীর অদম্য লড়াই ও প্রতিষ্ঠা এর মূল বিষয়। পাশে পেয়েছে শিক্ষা দীক্ষায়, চিন্তা চেতনায় অগ্রসর এক সহৃদয় বন্ধুকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে উদার মানবিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে চান বলেই বন্ধুটিকে উদার ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হিসাবে চিত্রিত করেছেন লেখক। একজন মানবতাবাদী শিক্ষক হিসাবে আগে থেকেই জানেন তিনি, সমাজকে কী বার্তা দিতে হবে। সেই জন্য চরিত্রের হয়ে ওঠার ব্যাপারটা এখানে তেমন নেই। পারিপার্শ্বিক বর্ণনার সামান্যতম সুযোগ নিলেও এই উপন্যাসের কলেবর অনেকটাই প্রসারিত হত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা না হয়ে, উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদ টানটান ঘটনার অভিঘাতে দ্রুত এগিয়েছে। কাহিনি যেমন গতিশীল, ভাষাও তেমনি সুস্বাদু, প্রাঞ্জল। গ্রামীণ মানুষের মুখের ভাষার হুবহু ব্যবহার, বিশেষ করে মুসলমান অন্দর মহলের ভাষা ব্যবহারে লেখকের মুনশিয়ানা স্বতন্ত্রভাবে তারিফ করার মতো। তবে 'রুকসানা' উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পুরুষতন্ত্র কী ভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে দমিয়ে রাখতে চায়, তার ভাষ্য নির্মাণ। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা ও স্বনির্ভরতা বিষয়ে এখনো যে ভয়াবহ রকমের সামাজিক অনীহা রয়েছে গ্রামীণ মুসলমান শিক্ষিত এবং নাশিক্ষিত মহলের অনেকাংশে, লেখক সেটা কাছ থেকে দেখেছেন বলেই তাকে জীবন্ত করে তুলে এনেছেন।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখি পড়াশোনা করে মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখা দরিদ্র কেরামত শেখের আদরের রূপসী কন্যা রুকসানার বিয়ে হয়ে যায় যথেষ্ট সম্পদশালী নিয়ামত

মোল্লার ছেলে এবাদত মোল্লার সঙ্গে। এবাদত প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। বিজ্ঞানের স্নাতক। পরে হাই স্কুলের শিক্ষক হয়েছে। রুকসানা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে ফার্স ডিভিশনে। বিয়ের পরেও সে পড়তে চায়। তার শ্বশুর ও পাড়া পড়শির অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবাদতের সহায়তায় রুকসানা ভর্তি হয়ে যায় কলেজে। তন্ময়ের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে। আর এই সম্পর্ক যে স্বাভাবিক তা মেনে নিতে পারে না এবাদত ও তার পরিবার। দুটি ভিন্ন ধর্মের তরুণ তরুণীর বন্ধুত্ব মেনে নিতে পারে না রুকসানার পারিপার্শ্বিক সমাজও। নিয়ামত মোল্লা জুম্মার নামাজ পড়তে গিয়ে লোক মুখের রটনা শুনে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অকথ্য গালিগালাজ করলে রুকসানা পিত্রালয়ে চলে আসে। দীর্ঘদিন বাপের বাড়িতে মেয়ের থাকা সন্দেহজনক। এবাদত একবার নিতে আসে। রুকসানা তখন কলেজের টপার হয়ে উচ্চতর পড়াশোনার স্বপ্ন দেখছে। আর এবাদত এসেছে আর লেখাপড়া না করে সুখে ঘরকন্না করার প্রস্তাব নিয়ে। এবাদতকে খালি হাতেই ফিরে যেতে হয়। সে অল্পবয়সী এক নিকটআত্মীয়াকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করে। এদিকে নতুন বধূ খুব মুখরা। এবাদত ও তার পরিবার সেবাপরায়ণা, শান্ত স্বভাবের রুকসানার অভাব অনুভব করতে থাকে। এরই মধ্যে সমস্ত সামাজিক চাপ উপেক্ষা করে কঠোর অধ্যবাসায়কে সম্বল করে তন্ময়ের সাহচর্যে রুকসানা এক সময় উত্তরবঙ্গের এক কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেয়। পাঠদান আর সমাজ সেবায় রুকসানা হয়ে ওঠেন একটা আইকন। তন্ময় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এবাদত দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার কাছে ফিরে আসতে চাইলে রুকসানা বিস্মিত হয়। ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় সে। এরপর ব্যক্তি জীবনের গণ্ডির বাইরে সমষ্টির সেবায় গভীর ভাবে আত্ম নিয়োগ করতে দেখা যায় তাকে।

তন্ময়ের সঙ্গে দীর্ঘ বন্ধুত্বের সূত্র ধরে একটা মানবিক সম্পর্ক বন্ধনের অবকাশ ছিল। লেখক সেদিকে যাননি। বিপরীতে রুকসানাকে উদার মুসলিম নারী হিসাবেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। নামাজী পরিবারে মেয়ে। বিদ্যার্জনে বা প্রতিষ্ঠিত জীবনাচরণের সাথে ধর্মীয় আচারের কোন সংঘাত নেই, এটা প্রমাণিত হয় রুকসানার নিয়মিত নামাজ আদায়ের দৃশ্যে। আসলে লেখক জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, পুরুষতন্ত্র ধর্মের দোহায় দিয়েই নারীকে গৃহবন্দি করে রাখতে চায় অথচ এই ইসলামেই নারী পুরুষ উভয়ের শিক্ষালাভ ফরজ বা অবশ্যকর্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছে। এই দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটেই সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার বাসনা নিয়ে লেখক রুকসানাকে সাধারণ মেয়ে থেকে এক বিদূষী মহিলায় উন্নিত করেছেন। আর এটা করতে গিয়ে শিক্ষক আশরাফুল মণ্ডল কখনো কখনো লেখক আশরাফুল মণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। রুকসানা হয়ে উঠেছে একটি শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার নাম। উপন্যাস যতটা পল্লবিত হতে পারত, ততটা হয়নি। তবে বিষয়ের মাহাত্ম্যে, রচনার প্রাঞ্জলতায়, কাহিনির গতিময়তায় আর মানবিক আকুতিতে এই উপন্যাসের গুরুত্ব দীর্ঘদিন অনুভূত হবে সন্দেহ নেই।

— জাহির আব্বাস

রুকসানা—আশরাফুল মণ্ডল, পালক পাবলিশার্স, ১৯৯/-

ডোমকল কলিংয়ের সাংস্কৃতিক সম্মিলন

মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমায় শিক্ষা-সংস্কৃতিতে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'দ্য ডোমকল কলিং'। গত ১৫ মে, ২০২২ এই পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষ্যে মানিকনগর ল' কলেজ অডিটোরিয়ামে দিন ব্যাপী একটি মনোজ্ঞ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভামুখ্য'র আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা শিক্ষাবিদ শামসুল আলম মহাশয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পত্রিকার সম্পাদক ও সাহিত্য সংগঠক এম এ ওহাব কবি-সাহিত্যিকদের সামাজিক ক্ষেত্রে আরও দায়িত্ববান হওয়ার আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানে 'তাজউদ্দিন বিশ্বাস স্মৃতি সম্মান, ২০২২' প্রদান করা হয় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইফুল্লা-কে। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষা সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক চন্দ্রপ্রকাশ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় যুগ্ম নিবন্ধক ইনাস উদ্দীন, অধ্যাপক মানস রঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ। তাজউদ্দিনের স্মৃতিপত্র পাঠ করেন চিত্রনাট্যকার তানবির কাজি, সংবর্ধনা পত্র পাঠ করেন কবি সাহিন রেজা বিশ্বাস। বহরমপুরের প্রখ্যাত বাচিকশিল্পী রাখি বিশ্বাস তাঁর আবৃত্তিতে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সংগীত পরিবেশন করেন সাইদুল ইসলাম, আব্দুস সালাম, আর্জিনা মবিন প্রমুখ। নৃত্য পরিবেশন করে মৌপর্ণা পাল, সংগীতা রহমান ও নৃত্যাক্ষ। এই দিন বিদ্রোহী কবিতার একশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট গল্পকার এম নাজিম। বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করেন পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ইসা আনসারী। অমল কুমার সাহা, নাজমুন নাহার খাতুন, নৌরিন সুলতানা-র আবৃত্তি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। বিশেষ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাহিত্যিক কালাম শেখ, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক মবিনুল হক এবং অধ্যাপক বিভাস বিশ্বাস। সকাল ১১ টা থেকে প্রায় ৭ ঘন্টা অনুষ্ঠান চলে।। সব শেষে ছিল কবিতা পাঠের আসর। কবি সম্মেলনে কবিতা পাঠ করেন নাদিয়া ও মুর্শিদাবাদের দূরদূরান্ত থেকে আগত কবিগণ। এই কবি সম্মেলনে নবীন ও প্রবীণ কবিদের সাম্প্রতিক কবিতা চর্চার একটি প্রাণচঞ্চল চিত্র উঠে আসে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন গল্পকার রাশিদুল বিশ্বাস, স্মৃতি হালদার এবং আব্দুল ওহাব।

গ্রেস কটেজে নজরুল জন্মজয়ন্তী

নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতী রিক্তা কুন্ডু, লেখক মইনুল হাসান, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও নদীয়া জেলা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক কৃষ্ণাভ ঘোষ, সচিব সৌমেন দত্ত প্রমুখের উপস্থিতিতে গত ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ (২৬ মে, ২০২২) তারিখে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হল কৃষ্ণনগরে কবির স্মৃতি বিজড়িত গ্রেস কটেজে। সকাল ৯-৩০ এ কবির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্য অর্পণ সহ পথ পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ কালপর্বে প্রায় তিন বছর বিদ্রোহী কবি কৃষ্ণনগরে বসবাস করেন। এর মধ্যে আড়াই বছর কাটান গ্রেস কটেজে। স্থানীয় 'সুজন বাসর' নামক সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে প্রায় ধ্বংসের মুখ থেকে ফিরে আসা এই ভবনটি ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক হেরিটেজ ভবন হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

আলোচনা পর্বে বিশিষ্ট অতিথি মইনুল হাসান তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কাজী নজরুল ইসলামের সমস্ত রকম বিভেদ ও বিভাজনের ঊর্ধ্বে থাকা মানবতার দিকটি উল্লেখ করে বর্তমান সময়ে নজরুল চর্চার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। মাননীয় সভাধিপতি মহাশয় গ্রেস কটেজকে কৃষ্ণনগর তথা সামগ্রিক ভাবে নদীয়া জেলার একটা ঐতিহ্যবাহী সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, মহান ব্যক্তিত্বের স্মৃতি বিজড়িত এই ভবনকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং জেলাসহ জেলার বাইরের সাধারণ মানুষের কাছে যথোচিত মর্যাদায় তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন, গ্রেস কটেজকে পর্যটন মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। তার জন্য চাঁদসড়ক রোডে প্রবেশপথে একটি তোরণ নির্মাণ সহ স্টেশন এবং জাতীয় সড়কে শহরের প্রবেশ মুখে উপযুক্ত হোর্ডিংয় স্থাপনের প্রস্তাব দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তপন কুমার বিশ্বাস, শঙখশুভ্র সরকার, পল্টু বিশ্বাস, সমীর দে দীপংকর দাস, বর্ষীয়ান শিল্পী সীমা বড়াল এবং এই প্রজন্মের অল্পবয়সী শিক্ষার্থী হৃত্বিশ বৈরাগ্য, অয়ন্তিকা মজুমদার ও স্পন্দন শাহীন। কবিতা আবৃত্তি করেন বাচিকশিল্পী পীতম ভট্টাচার্য, সুকৃতি ঘোষ, সৌমেন দত্ত, জয়িতা সাহা, রবীন্দ্রকুমার হালদার, সুশান্ত ঘোষ, গৌরী সাহা, পরেশচন্দ্র রায়, সাহানা খাতুন এবং কল্পনা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের পক্ষে সমবেত উপস্থাপনায় অংশ নেন প্রিয়াঙ্কা, মৌটুসী, স্নিগ্ধা, পর্ণা ও তানিয়া। একক নৃত্যে অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলে নৃত্য প্রতিষ্ঠান 'ছন্দভূমি'-র তিন ছাত্রী রাইমা, ঐশিকা, সানা। নানাভাবে অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি করেন, বাসুদেব, রবি বিশ্বাস, সুপ্রতিম কর্মকার, গোপীনাথ দে, সর্বানী দত্ত, শোভনা দে, তপনকুমার ভট্টাচার্য, শেখ রমজান, রাঙ্গিস খাতুন, পল্লবী চক্রবর্তী, গৌতম ধোনি প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় দীপংকর দাসের পৌরোহিত্যে; সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ইনাস উদ্দীন।